SCAN

BANSDOC Library Dhaka

# নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রকাশকালঃ জুন, ২০১৩

- বিজ্ঞান চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ
- ধাতু এবং জীবন
- চেনা উদ্ভিদের অজানা গুণ
- ঈশ্বরকণা ও সত্যেন বোস

# নবীন বিজ্ঞানী

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০১৩

**সম্পাদক ঃ**
অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী

**প্রচ্ছদ ঃ**
শ্যামল বসাক

**অঙ্গ সজ্জা ঃ**
মোঃ জিয়াউদ্দিন

**প্রকাশনায় ঃ**
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ**
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

**যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২০৮৪
ই-মেইল ঃ infonmst@gmail.com

## সূচীপত্র

| শিরোনাম | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ▸ প্রাতিস্বিক ফোটন-কণার জীবন ও মৃত্যু এবং তার পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ | অধ্যাপক এ.এম. হারুন অর রশীদ | ১ |
| ▸ টেক্সটাইল ঃ শিল্প বিপ্লবের নতুন সূচনা | মোরছালিনা ইসলাম (কথা) | ৩ |
| ▸ আইনস্টাইন-পূর্ব আপেক্ষিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | প্রকৌশলী সুকল্যাণ বাছাড় | ৭ |
| ▸ সমস্যার উত্তর দিতে পারে গবেষণা | ড. আকন্দ সামসুন নাহার | ৯ |
| ▸ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্সরে | মোঃ হাবিবুর রহমান | ১২ |
| ▸ রোগের চিকিৎসায় পশুপাখির সাহচর্য | নিশাত তাসনিম সাফা | ১৮ |
| ▸ বিজ্ঞান চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ | শহিদুল ইসলাম | ২০ |
| ▸ ধাতু এবং জীবন | ড. কালিপদ কুণ্ডু | ২৩ |
| ▸ ঈশ্বরকণা ও সত্যেন বোস | জহুরুল হক বুলবুল | ৩০ |
| ▸ পৃথিবী, সূর্য ও তারাদের রহস্য | আফিয়া জাহান রশ্নী | ৩৪ |
| ▸ চেনা উদ্ভিদের অজানা গুণ | হোসনে আরা পারভীন | ৩৬ |
| ▸ কত অজানারে | মোর্শেদা বেগম রিপা | ৪১ |

# "নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

## লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দু'হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সে সব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২০৮৪
ই-মেইল ঃ infonmst@gmail.com
নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরোক্ত ঠিকানায় মহাপরিচালক-এর সাথে যোগাযোগ করুন

# সম্পাদকীয়

গত সংখ্যার মতো এ সংখ্যাতেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন অর রশীদের লেখা 'প্রাতিস্বিক ফোটন-কণার জীবন ও মৃত্যু এবং তার পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ' এর পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হয়েছে। আশাকরি পাঠকদের ভাল লাগবে। এছাড়া বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ে বিভিন্ন লেখকদের প্রবন্ধ সংকলিত করা হয়েছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদার কথা বিবেচনা করলে অন্নের পরেই আসে বস্ত্রের কথা। বস্ত্র শিল্প নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছে। মানুষ একসময় গাছের পাতা, ছাল, বাকল ইত্যাদি পরিধেয় হিসেবে ব্যবহার করলেও কালের বিবর্তনে মানানসই, টেকসই ও যুগোপযোগী পোষাক তৈরি করতে শিখেছে।

বস্ত্র পরিধান সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকলেও বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা উপযোগী পোষাক ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরাপত্তা উপযোগী পোষাক যেমন–তাপমাত্রা নিরোধক পোষাক, নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর পোষাক, খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের পোষাক, বৈরী আবহাওয়া হতে বাঁচার জন্য পোষাক, তাপ সহ্যকারী পোষাক, মহাকাশে নিরাপত্তা উপযোগী পোষাক, বিস্ফোরক প্রতিরোধক পোষাক ইত্যাদি। ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাইরাসমুক্ত, রিঙ্কেলমুক্ত বস্ত্র তৈরী হচ্ছে। এসব বস্ত্র খেলাধুলার সামগ্রী ও জার্সি তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আয়ের সিংহভাগ আসছে তৈরি পোষাক খাত থেকে। পোষাক শিল্পে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্রাণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের বস্ত্রখাত উত্তরোত্তর বিকশিত হোক এ কামনা করছি।

'নবীন বিজ্ঞানী' পত্রিকা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মুখপত্র হিসেবে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজ করে যাবে–এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

শামীমা চৌধুরী
সম্পাদক
নবীন বিজ্ঞানী
ও
অধ্যাপক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

# প্রাতিস্বিক ফোটন-কণার জীবন ও মৃত্যু এবং তার পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ

## তৃতীয় তরঙ্গ

## ভবিষ্যতের কম্পিউটার বিপ্লব ঃ কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের জ্ঞান-তাত্ত্বিক সমস্যা

গত সংখ্যার পর ... ...

### (৩.১) নব কম্পিউটার বিপ্লবের মুখোমুখি বিভব

আয়ন ফাঁদের একটি সম্ভাব্য প্রয়োগ যা নিয়ে এখন অনেক বিজ্ঞানী স্বপ্ন দেখেন তা হল কোয়ান্টাম কম্পিউটার। বর্তমান যুগের চিরায়ত কম্পিউটার তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককের নাম হল বিট (bit) যার মান 0 অথবা 1। একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটারে তথ্যের মৌলিক একক হবে একটি কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট যা 0 এবং 1 উভয়ই হবে একই সঙ্গে। দুটি কোয়ান্টাম বিট একই সঙ্গে চারটি মান গ্রহণ করতে পারে—00,01,10 এবং 11। সুতরাং একটি অতিরিক্ত কিউবিট সম্ভাব্য সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে দেয়। কোয়ান্টাম বিটের সংখ্যা n হলে তখন সম্ভাব্য অবস্থার সংখ্যা হবে $2^n$। একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটারে যার রয়েছে শুধু ৩০০ কিউবিট তার থাকলে $2^{300}$ সংখ্যক সম্ভাব্য অবস্থা একই সঙ্গে যে সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের মোট পরমাণুর সংখ্যারও বেশি। ডেভিড ওয়াইনল্যান্ডের গবেষক দলটি পৃথিবীর প্রথম দল যারা দুটি কোয়ান্টাম বিট নিয়ে কাজ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। যেহেতু নিয়ন্ত্রণের কাজটি ইতোমধ্যেই করা হয়েছে তাই নীতিগতভাবে আর কোন বাধা নেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সৃষ্টি করা যেখানে আরো বেশি কিউবিট যোগ করে দেয়া হবে। আসলে এধরনের কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করাই এখন ফলিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মুখ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে দুটি পরস্পরবিরোধী দাবী মেটান প্রয়োজন। একদিকে কিউবিটগুলি তাদের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে যাতে তাদের কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। তা বিনষ্ট না হয়। একইসঙ্গে তাদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে শুধু যাতে তাদের মাধ্যমে গণনার ফল বাইরে পাঠানো যায়।

সম্ভত প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটারটি তৈরি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেটাই হবে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার যা গত শতাব্দীতে আধুনিক কম্পিউটার হিসেবে মানুষের সম্ভাব্য অবিশ্বাস্য পরিবর্তন করে দিয়েছে।

### (৩.২) কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের আপত পরস্পর বিরোধীতা

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বর্ণনা করে যে অতি ক্ষুদ্রের জগত তা খালি চোখে দেখা যায় না, যেখানে ঘটনা ঘটে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বৃত্তের বাইরে। যা এমনভাবে চিরায়ত জগতের সাধারণ জ্ঞানের বিপরীতে ঘটে বলে মনে হয়। কোয়ান্টাম জগতে রয়েছে একটা অবশ্যম্ভাবী অনিশ্চয়তা যার মূলে রয়েছে কোয়ান্টাম অবস্থার সমাহার তত্ত্ব (superposition theory)। এই তত্ত্বের তাৎপর্য এই যে একটি কোয়ান্টাম কণা বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে একই সঙ্গে একই সময়ে। একটি মার্বেল একইসঙ্গে একই সময়ে এখানে আছে, কখনো আছে এটা আমরা চিন্তা করি না। কিন্তু কোয়ান্টাম মার্বেলের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। এই মার্বেলের সমাবেশকৃত অবস্থায় বলে যে, কোন সঠিক সম্ভাবনাটি মার্বেলটি বাস্তবায়িত করেছে তা জানা যায় যখন আমরা তার ওপর মাপনে প্রক্রিয়া প্রয়োগ করি। মাপনের পূর্বে মার্বেলটির অস্তিত্বই নেই।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এ৬উইন শ্রডিঙ্গার এই ১৯৫২ সালে লিখেছেন -

> আমরা কখনও একটা ইলেকট্রন বা একটা পরমাণু বা একটি ক্ষুদ্র কণা নিয়ে কখনও পরীক্ষা করি না। অবশ্য আমাদের মানস পরীক্ষাতেই আমরা এটা অনুমান করি যে, এটাই আমরা করছি কিন্তু এটা অবধারিতভাবে হাস্যকর অবস্থার উৎপত্তি ঘটায়।

শ্রডিঞ্জারের মার্জার নিয়ে মানস পরীক্ষায় একটি মার্জার একটি বাক্সে রাখা হল বহির্বিশ্বে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এবং পাশে রাখা হল মারাত্মক সায়ানাইডের একটি বোতল যা বাইরে থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় ভেঙ্গে ফেলা যায়। বোতলটি ভাঙ্গা হলে মার্জারটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে কিন্তু যে কোন মুহূর্তে বাক্সে রয়েছে "ভেঙ্গে যাওয়া পরমাণু" এবং এখনও ভাঙ্গেনি এমন অবস্থার সমাহার। এখন আপনি যদি বাক্সটিকে পুড়িয়ে দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন মৃত এবং জীবিত মার্জারের সমাবেশ কেননা "মৃত" অথবা "জীবিত" এই দুটিমাত্র অবস্থাই মার্জারের ললাট-লিখন কিন্তু কোনটা তা আমরা বলতে পারি না।

শ্রডিঞ্জারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মানস পরীক্ষার ফল এই উদ্ভট সিদ্ধান্ত যে, যে কোন মুহূর্তে মার্জারটি মৃত বা জীবিত তা আমরা জানি না। পরবর্তীকালে শ্রডিঞ্জার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর এই মানস পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার অতিপরিচিত "গণ্ডগোলের" মধ্য আরো একটি গণ্ডগোল যোগ করেছিলেন। শ্রডিঞ্জারের মার্জার এবং হারোস ও ওয়াইনল্যান্ডের ফাঁদে আটকানো কোয়ান্টাম কণা একই সময়ে দুই অবস্থায় থাকতে পারে যাকে আকজাল বলা হয় "জটপাকানোর অবস্থা" (entangled state)। বোধহয় রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটিকেই তাঁর "বিশ্ব পরিচয়" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন "বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ" বলে তাঁর ভাষায়।

"আজ বয়সের শেষার্ধে মন অভিভূত নব প্রাকৃত তত্ত্ব–বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমানস আজ বেঁচে থাকলে খুশী হতেন এটা জেনে যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান প্রাতিস্বিক ফোটন বা আয়নকে ফাঁদে আবদ্ধ করে তার ওপর পরীক্ষা করা শুরু করেছে এবং ফাঁদ বা গহ্বরের অভ্যন্তরস্থ কণার সংখ্যাও প্রাতিস্বিকভাবে গণনা করা সম্ভব করেছে। এভাবেই প্রাতিস্বিক কোয়ান্টাম কণার অবস্থার বিবর্তন বাস্তব সময়ে (real time) বিবর্তন দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। এভাবে হারোস এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রাতিস্বিক কোয়ান্টাম কণার অবস্থার বিবর্তন বাস্তব সময়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে বলে শোনা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মায়াবাদ গ্রহণতার সব রহস্য বর্জন করতে পেরেছে বলেই মনে হয়।

অধ্যাপক এ.এম. হারুন অর রশীদ
প্রাক্তন অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

# টেক্সটাইল ঃ শিল্প বিপ্লবের নতুন সূচনা

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে বস্ত্র হচ্ছে দ্বিতীয় । বস্ত্রশিল্প এমন একটি শিল্প, যা কিনা সূচনা ঘটিয়েছে নতুন সভ্যতার । কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি কীভাবে এসেছে এই বস্ত্র ? কেনইবা এর এত চাহিদা ।

মানুষ যখন সভ্যতার দুয়ারে পর্দাপণ করেছে তখনই প্রয়োজন অনুভব করে বস্ত্রের । কারণ সভ্য জাতির মধ্যে বোধশক্তি জেগে ওঠে, লজ্জাস্থান নিবারণ করার জন্য ব্যবহার করে থাকে গাছের পাতা, ছাল, বাকল । যদিও বস্ত্রশিল্পের প্রধান ধারণা শুরু হয়েছিল পাতা, ছাল, বাকল প্রভৃতি দ্বারা কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ তা রূপ নিয়েছে মাননসই, টেকসই, যুগোপযোগী পরিধান হিসেবে ।

বস্ত্র শুধু আমরা পরিধান সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে থাকি । কিন্তু কখনো ভেবে দেখি না এর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের নানা দক্ষতা, যা কিনা আমাদের যুগোপযোগী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে । শুধু যুগোযোগী পোশাকই নয় নিরাপত্তা উপযোগী পোশাক তৈরিতে বিজ্ঞানীদের জুড়ি নেই । গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে কলকারখানার শ্রমিক এবং সেনাবাহিনীদের জন্য নিরাপত্তা উপযোগী পোষাক । প্রধানত waver, knitted এবং non-waver তন্তু থেকে তৈরি করা হয়ে থাকে নিরাপত্তা উপযোগী পোষাক । বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা উপযোগী পোষাক ব্যবহৃত হচ্ছে; তা হল –

১ । স্ফুলিঙ্গ বাঁধা হতে রক্ষা করার জন্য পোষাক;
২ । উচ্চ তাপমাত্রা নিরোধক পোষাক;
৩ । নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনী পোষাক;
৪ । ভূ-গর্ভস্থ কয়লাক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের পোষাক;
৫ । বৈরী আবহাওয়া হতে বাঁচার জন্য পোষাক;
৬ । পানিরোধক শ্বাসযোগ্য তন্তু;
৭ । তাপ সহ্যকারী তন্তু;
৮ । ধাতব পদার্থ হতে রক্ষাকারী বস্ত্র;
৯ । ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধক বস্ত্র;
১০ । মহাকাশে নিরাপত্তাযোগী বস্ত্র;
১১ । রাসায়নিক পদার্থ হতে নিরাপত্তাযোগী বস্ত্র;
১২ । বিস্ফোরক প্রতিরোধক, ইত্যাদি ।

খেলার বেলায়ও বর্তমানে চলে এসেছে টেক্সটাইলের ছোঁয়া যথা–জুতা, খেলার সরঞ্জাম, গ্রীষ্মকাল ও শীতকালর খেলার উপযোগী পোষাক, আভ্যন্তরীণ খেলার পোষাক । কিছু কিছু খেলায় টেক্সটাইল ব্যবহার হচ্ছে । যথা–গল্ফ, টেনিস, পর্বত আরোহণ, স্কি, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি ।

পোষাক থেকে বিদ্যুৎ? কথাটি শুনে অনেকেই হতচকিত হবেন আবার কেউ কেউ ভাবছেন রসিকতা করছি? মোটেও না । ধরুন দূরে কোথাও গেলেন, হঠাৎ মোবাইল বা আইপডের চার্জ ফুরিয়ে গেলেও আশেপাশের মোবাইল বা আইপডের চার্জ দেয়ার মতো তেমন কোন সুযোগ নেই । চুপচুপ বসে থাকবেন? না-হ ..... একটু দাঁড়িয়ে হাঁটাহাঁটি করে আসুন এতেই আপনার পোষাকেই উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ ।

ন্যানোপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অসম্ভব ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তুলেছেন বিজ্ঞানীরা । শক্তির সংকট এমন বিশ্বজুড়ে । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছেন শক্তি উৎপাদনের আর এরই ধারাবাহিকতা সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি" এর একদল গবেষক জানালেন কাপড় থেকে শক্তি উৎপাদনের কথা । বিজ্ঞান সাময়িকী "নেচার" সম্প্রতি এ-তথ্য জানিয়েছে । ন্যানো প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা এসব পোষাক শরীরে নড়াচড়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে । এই পোষাকের নাম দেয়া

হয়েছে "পাওয়ার শার্ট"। পাওয়ার শার্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপড়ের তন্তুর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে অতি সুক্ষ্ম জিংক অক্সাইডের ন্যানোতার। এসব ন্যানোতারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি পিজোইলেকট্রিক ইফেক্ট (piezoelectric effect) হিসেবে পরিচিত। চাপ (stress) প্রয়োগ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রক্রিয়া পিজোইলেকট্রিক ইফেক্ট নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে জিংক অক্সাইডের ন্যানোতারবেছে নেয়ার পেছনে প্রধান কারণ ছিলো পিজোইলেকট্রিক ধর্ম। জিংক অক্সাইড পিজোইলেকট্রিক ধর্ম প্রদর্শন করে এবং তা অর্ধপরিবাহী। পরীক্ষাগারে যেসব ন্যানোজেনারেটর তৈরি করা হয়েছে এসব থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ অনেক কম। বিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করছেন একের অধিক ন্যানোজেনারেটর ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই অভিনব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিভিন্ন মোবাইল, আইপডের মতো বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক্স পণ্যের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করবে।

ছবি ১

আজ বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে টেক্সটাইল শুধুমাত্র বস্ত্র তৈরিতে তা সীমাবদ্ধতা থাকেনি। যেসব ক্ষেত্রে টেক্সটাইল ব্যবহার করা হচ্ছে তা হল–Geo Textile সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন পদাপণ সৃষ্টি করেছে। Geo Textiles গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বর্তমান কৃটিপাত নক্সা এবং ভরণ পোষণ পদ্ধতিতে। Geo Textiles আদর্শ পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে রাস্তা তৈরির কাজে, রেলস্টেশন তৈরির কাজে, সুউচ্চ লাইন, জেলের মত ক্ষেত্রে ...

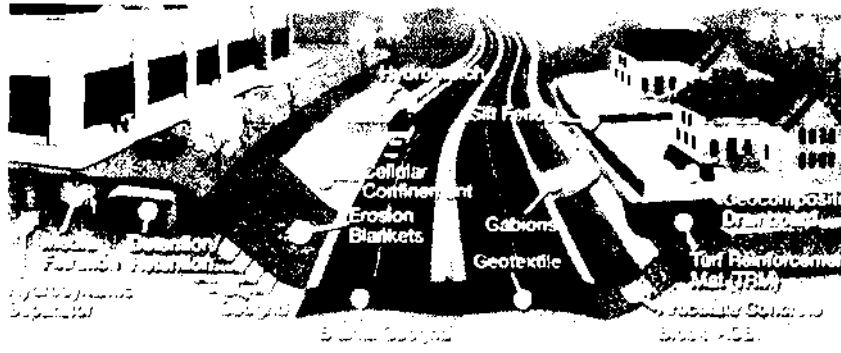




ছবি-২ : Application of Geotextiles in Civil Engineering

Geo Textile-কে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের এবং অন্য অংশ Geosynthetics বলে থাকে। তারা এটি তৈরি করে থাকে পরিমিত পলিমার (পলিপ্রপাইলিন, পলিইথাইলিন এবং পলিস্টার) এবং প্রধান পাঁচ ধরণের woven, heat bonded, needle, punched, knitted এবং সরাসরি মাটি মিশ্রিত তন্তু দ্বারা।

**রাস্তা তৈরিতে :** প্রধানত Geotextile কে একত্রীভূত করা হয় মাটির সাথে যা ব্যবহৃত হয় ঢালাই এর কাজে, ইস্পাতের ধাতুর দ্বারা। তন্তুটি ব্যবহার করা হয় ভূমির স্তূপের textile strength করার যেখানে shear stree সাধারণভাবে উৎপাদিত হয়।

**টেক্সটাইল কম্পোজিট পদার্থ (TCM) :** দুইটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তুকে মিশ্রিত করে যেখানে নতুন বস্তু তৈরি করা হয়, তাকে কম্পোজিট পদার্থ বলে। যা কিনা মিশ্রিত দু'পদার্থ হতে ভিন্ন কিন্তু নতুন গুণগত

বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। টেক্সটাইল এবং বস্ত্র কারখানার প্রযুক্তিকে উন্নত করার ক্ষেত্রেও টেক্সটাইল কম্পোজিট পদার্থ ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্তমানে রীতিসম্পন্ন ধাতব পদার্থকে স্থানান্তর করা হচ্ছে–কম্পোজিট পদার্থ দ্বারা। কারণ এদের রয়েছে হালকা ওজন, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন, নমনীয়তা এবং দীর্ঘায়ু। প্রধানত বিমান চালনবিদ্যায় (aeronautical) প্রয়োগ করা হয়ে থাকে কম্পোজিট পদার্থ–কারণ এটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন। সমান গুণগতসম্পন্ন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যয় কমায় বলে টেক্সটাইল কম্পোজিট পদার্থ ব্যবহার হয়ে থাকে



চিত্র: ৫ Application of textile composite material in aeronautical

**নিরাপত্তা পোশাক এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ ঃ** টেক্সটাইল কম্পোজিট পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে নিরাপত্তা পোশাক এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ (দস্তানা, মাথায় পরিধান উপযোগী, পায়ে পরিধান উপযোগী) যা কিনা রক্ষা করে থাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে [illegible] তাপমাত্রায় এবং উচ্চ বৈদ্যুতিক জটকা স্ফুলিঙ্গ দমন অথবা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ হতে।

**চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রকৌশলী পদার্থ ঃ** চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে ভাঙ্গা পা জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে। Textile casting হিসেবে, দেহ অংশ ধারণ, হাঁটার সাহায্যকারী কাঠামো ইত্যাদি। প্রকৌশল পদার্থ হিসেবে যথা–geotextile যন্ত্রপাতি ধারণবস্তু হিসেবে, অন্তরক পদার্থ হিসেবে, ফিল্টার, সামুদ্রিক জাহাজের গঠনকাঠামো ইত্যাদি

Construction material হিসেবে টেক্সটাইল ব্যবহার অনেকের কাছে আজব ব্যাপার। কিন্তু ২০১০ সালের মে মাসে prefabricated textile concrete দিয়ে সফলভাবে একটি ব্রিজ তৈরি করা হয় জার্মানির আলাস্কটাড লটলিপজেন শহরে। Groz-Beckert Company এই নতুন প্রযুক্তির ধারক হিসেবে তাদের এই ব্রীজ তৈরির পেছনে কিছুটা যৌক্তিকতা পেশ করেছে। যথা–Textile bridge has absolutely corrosion resistant, it has a life time of 80 years etc.

টেক্সটাইল ল্যাটিস এর সাথে alkali-resistant (AR) glass দিয়ে তৈরি roving সংযুক্ত করে তালিকার সাথে structure তৈরি করা হয়। আরো শক্তিশালী structure পাবার জন্য epoxy resin দিয়ে roving কে coated করা হয়। এই epoxy resin এর কাজ হলো filmant গুলোকে load transfer-এ সক্ষম উপযোগী textile strength প্রদান করা। এ প্রক্রিয়ায় ২ মিমি ব্যাসের একটা Roving ১০০০ নিউটন/মিমি textile strength (যে load প্রদান করলে materials break করে) দিতে পারে।

বাংলাদেশে টেক্সটাইলের অগ্রগতির ইতিহাস অনেকেরই অজানা। গত বছর ইউরোপীয় কমিশন আমদানী পণ্যের জন্য তাদের রুলস অব অরিজিন পরিবর্তন করেছে। এর ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। ২০০৯ সালে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানীর দুই বছরের মধ্যে দ্বি-গুণ হবে এবং দেশীয় কাপড়ের চাহিদাও কার্যত বাড়বে। কেবল তৈরি পোশাক নয়, আরও কিছু সুনির্দিষ্ট ম্যানুফেকচার্ড পণ্যের জন্যও এই শর্ত প্রয়োজ্য। বাংলাদেশসহ ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশ এই সুবিধা ভোগ করবে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তান এই সুবিধা পাবে না। ২০০৯ সালে ইউরোপে সবচেয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছিল বাংলাদেশের এমনকি চীন, ভিয়েতনামও রপ্তানী বৃদ্ধিহারে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে ছিল, ভারত ত বটেই। ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে ইউরোপে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রপ্তানী বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩ শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানী বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ১৫ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন রুলস অব অরজিনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সুযোগ এসেছে তৈরি পোশাক রপ্তানীতে

চীনের বাজার দখল করার। এছাড়াও যেহেতু ভারত ও চীন বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরি ছেড়ে দিয়েছে তাই বাংলাদেশের অবস্থান আরও দৃঢ় হচ্ছে। ইউরোপের পোশাক আমদানী বর্তমানে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ইউরো। বাংলাদেশকে ২০১৫ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পোশাক বাজারে নূন্যপক্ষে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ। যার অর্থনৈতিক আয়ের ৮০ ভাগ আসে বস্ত্রশিল্প থেকে। কিন্তু বস্ত্র প্রকৌশল সম্পর্কে মানুষের ধারণা আজও সৃষ্টি হয়নি। যেখানে নির্ভর করে আছে বাংলাদেশের আয়ের মানদণ্ড। অনেকেই ভাবেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ কী ? কেনইবা এদেরকে উচ্চ বেতনে চাকরি দেয় টেক্সটাইল শিল্প মালিকরা। শতকরা ৮০ ভাগ লোকই জানেন না টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার মানে কাপড়-চোপড়ের ইঞ্জিনিয়ার না। এটি সম্পূর্ণ একটি ম্যানুফ্যাকচারিং বেসড একটি প্রসেস।

নাসার বিজ্ঞানীরা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মহাকাশে মানুষ পাঠাতে কাজ করে যাচ্ছেন তারা অসংখ্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গবেষণায় নিযুক্ত করে স্পেস স্যুট এবং ন্যানোসাইবার, কার্বন ফাইবারের শিল্ড তৈরির জন্য।

বাংলাদেশে একমাত্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "মেইড ইন বাংলাদেশ" ট্যাগ এ ব্রডিং শুরু করেছে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জিন্স ব্র্যান্ড "এইচ এন্ড এম" শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকেই বছরে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য নিয়ে থাকে।

যারা হলিউডের মুভি দেখে অভ্যস্ত তারা কয়জনে জানে এইসব নামিদামি সেলিব্রেটিস বাংলাদেশ এর নামকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে জানে ? ফুটবল বিশ্বকাপে গ্রেড ওয়ান জার্সি, ন্যাটোর ক্যামোয় লেজ ড্রেস থেকে শুরু করে না এই দেশের টেক্সটাইল প্রোডাক্ট এর উপর ? আর যারা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত করেছেন তারা এই দেশেরই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররাই। বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

মোরছালিনা ইসলাম (কথা)
ছাত্রী (২য় বর্ষ)
বি.এস.সি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
টাঙ্গাইল

# আইনস্টাইন-পূর্ব আপেক্ষিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গতির প্রপঞ্চটি নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা শুরু হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টোটলের কাছে সুস্পষ্ট ছিল যে কোন বাহ্যিক বল দ্বারা তাড়িত না হলে বস্তুসকল তাদের পছন্দসই স্থির অবস্থায় থাকবে। তিনিও পরম স্থান ও পরমকালের ধারণায় বিশ্বাস করতেন–অর্থাৎ স্থান ও কাল উভয়ে নিজস্ব অধিকারে, তারা একে অপরের সাথে এবং অন্যান্য বস্তুসমূদয়ের সাথে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। এভাবে, এরিস্টোটলের কাছে, ঘটনাবলীকে অবস্থান ও কালের পরম মানের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। এরিস্টোটলের কাজ এত উচ্চ শ্রদ্ধায় সমাসীন ছিল যে ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত মূলত অবিকৃত রয়ে রয়েছিল, যখন না গ্যালিলিও দেখিয়েছেন যে, এটি ভুল।

দৃষ্টিভঙ্গিটি হল যে গতি আবশ্যিকভাবে আপেক্ষিক–অর্থাৎ কোন প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থায় বস্তুর সরণ জড়িত থাকে–গ্যালিলিও থেকে এর সূত্রপাত হয়েছিল। গ্যালিলিওর পরীক্ষা ও "কল্প পরীক্ষা" তাঁকে এমন অবস্থায় পরিচালিত করেছিল যাকে বর্তমানে বলা হয় গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতা নীতি: স্থির কিংবা ধ্রুব বেগে চলমান কোন কোন বস্তুর জন্য বলবিজ্ঞানের আইন একই।

আদ্যস্থল হিসেবে গ্যালিলিও-এর পরিমাপ ব্যবহার করে আইজাক নিউটন গতির আইনগুলো ও তাঁর সার্বজনীন মহাকর্ষের আইনের উন্নয়ন ঘটান। নিউটন দেখিয়েছেন যে, কেবলমাত্র অন্যকোন কাঠামোর সাপেক্ষে কোন প্রসঙ্গ কাঠামোর আপেক্ষিক গতিবেগ বের করা সম্ভব, কিন্তু কোন কাঠামোর পরম গতি বের করা যায় না। ফলে, যতদূর পর্যন্ত বলবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট থাকে, কোন পছন্দসই অথবা পরম প্রসঙ্গ কাঠামোর কোন অস্তিত্ব থাকে না। নিউটনীয় আপেক্ষিকতা নীতিকে এভাবে বিবৃত করা যায় যে: সকল জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোতে বলবিজ্ঞানের আইনগুলো একই থাকে।

এভাবে, গ্যালিলিও ও নিউটনের কারণে, পরম স্থানের ধারণা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল যখন থেকে যান্ত্রিক পরিমাপ তৈরি করা যায় এমন কারো সাপেক্ষে কোন পরম প্রসঙ্গ কাঠামো থাকতে পারে না: যাইহোক, গ্যালিলিও ও নিউটন পরম সময়ের ধারণা, বা একই সময়ে ভিন্ন অবস্থানে ঘটা দুইটি ঘটনা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা বহাল রেখেছিলেন। অন্য কথায়, যদি কোন এক প্রসঙ্গ কাঠামোর মধ্যে কোন পর্যবেক্ষক একযোগে ভিন্ন অবস্থানে দুইটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন, তবে সব প্রসঙ্গ কাঠামোর সকল পর্যবেক্ষকগণ একমত হবেন যে, ঘটনাদ্বয় যুগপৎ।

স্থান ও কালের গঠনের নিউটনীয় ধারণা উনবিংশ শতাব্দীতে মূলতঃ মাইকেল ফ্যারাডে এবং জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব উন্নয়ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছিল। ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছেন যে, শূন্য মাধ্যমে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ গতিবেগ $c=3 \times 10^8$ m/s, আলোর গতিবেগে সঞ্চারিত হওয়া উচিৎ। উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদদের জন্য এটা একটি সমস্যা উপস্থাপন করে। যদি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ এই ধ্রুব গতিবেগ c-এ সঞ্চারিত হয়, তবে এই গতিবেগ কিসের সাপেক্ষে পরিমাপিত ? কিভাবে আপনি এটিকে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে পরিমাপ করতে পারেন। নিউটন পরম প্রসঙ্গ কাঠামোর ধারণা এড়িয়ে চলেছিলেন।

আপেক্ষিকতা সমস্যা থেকে বেশ দূরে, উনিশ শতকের পদার্থবিদদের কাছে এটি ধারণাতীত মনে হয়েছিল যে আলোক ও অন্যান্য তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, সকল অন্যধরনের তরঙ্গের বিপরীতে, মাধ্যম ছাড়া সঞ্চারিত হতে পারে। ইথার নামক মাধ্যমকে স্বীকার্য হিসেবে নেওয়াকে একটি যৌক্তিক ধাপ মনে করা হয়েছিল, এমনকি ইথার অসনাক্তযোগ্যতার জন্য এর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেমন শূন্য ঘনত্ব এবং নিখুঁত স্বচ্ছতা অনুমানের প্রয়োজন

পড়েছিল। এই ইথারকে মনে করা হত সমগ্র স্থা-ব্যাপী এবং সেই মাধ্যম যার সাপেক্ষে সকল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের c গতিবেগে সঞ্চারিত হবে। নিউটনীয় আপেক্ষিকতা ব্যবহার করে বলা যায় যে, ইথারের সাপেক্ষে u গতিবেগে চলমান কোন পর্যবেক্ষকের কাছে আলোক কিরণের গতিবেগ (c+u) বলে প্রতীয়মান হবে। তাই তাত্ত্বিকভাবে, যদি ইথার থেকে থাকে, তবে ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতির কারণে পৃথিবীস্থ কোন পর্যবেক্ষককের কাছে আলোর গতিবেগের পরিবর্তন পরিমাপ করতে সক্ষম হওয়া উচিত। মাইকেল্‌সন-মোরলে পরীক্ষা ঠিক এই প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

প্রকৌশলী সুকল্যাণ বাছাড়
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
ঢাকা

# সমস্যার উত্তর দিতে পারে গবেষণা

মানুষ কৌতূহল প্রিয়। তার মনে রয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। জানতে চাওয়ার তাগিদ তার সহজাত প্রবৃত্তি। আদিকাল থেকেই মানুষ উদ্ভাবন করে চলেছে, কারণ মানুষই সৃজনশীল চিন্তাশক্তির অধিকারী। এ বিশ্বের পরতে পরতে রয়েছে মানুষকে কৌতূহলী করার সম্পদ। মানুষ নিজেও একটি জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা তাকে তাড়িত করে নিয়ে চলেছে। মানব এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে খুঁজে প্রতিনিয়ত আবিস্কার করেছে এর সমাধান। সমস্যার সমাধানার্থে সদ্য যে প্রচেষ্টা তারই নাম (Research) 'গবেষণা'। সাধারণ অর্থে গবেষণা হল সত্যের অনুসন্ধান।

তাই বলা যায়, জ্ঞানের অনুসন্ধানের ভিত্তিই গবেষণা। মানুষের বেঁচে থাকার প্রতিস্তরেই রয়েছে গবেষণার প্রয়োজন। উন্নত বিশ্বে মানব শিশু ভুমিষ্ট হবার পূর্ব হতেই তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন দানের জন্য গবেষক তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সহায়তা করে থাকে। সুশীল জীবন পাবার জন্য আজকের বিশ্বে গবেষণা বড়ই আদৃত। এই গবেষণার ফলেই পৃথিবী আজ সভ্যতার চরম শীর্ষে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে গবেষণার প্রাধান্য গুরুত্ব স্বীকার করতে যেয়ে রাস্ক (Rusk) বলেছেন, "গবেষণা হল একটি অভিমত, মানস কাঠামোর একটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি। গবেষণা যেসব প্রশ্নের অবতারণা করে তার জিজ্ঞাসা ইতিপূর্বে কোনদিন হয়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথ ধরে গবেষণা তাঁর প্রশ্নের সমাধান খোঁজে।" গ্রীণের মতে (Green) "জ্ঞানানুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগই গবেষণা।" তাই বলা হয় "সুসংগঠিত জ্ঞানের আবিস্কার ও বিকাশের লক্ষ্যে নিবেদিত পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ডকে গবেষণা বলা যায়।"

গবেষণা শুরু হয় একটি সমস্যাকে বেছে নিয়ে, তার পর তার সমাধান কল্পে উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর এই তথ্য বা উপাত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্যকে বের করে আনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

শতশত বৎসর পূর্বে থেকেই গবেষণার অনুশীলন চলছে। সমস্যা সমাধানের নিরন্তন প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত, আনুষ্ঠানিক, সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক। আদিম মানুষ বারবার একটা কাজ করে ভুল করে (Trial and error) শুদ্ধ করে সমাধানে এসে পৌছত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ সুপরিকল্পিত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত থাকে। The Advanced Lerarner Dictionary of Current English পুস্তকে গবেষণাকে উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞানের যেকোন শাখায় সত্য ও নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক ও সযত্নে তথ্যানুসন্ধান।

গবেষণা হতে হয়ে বিজ্ঞান সম্মত। এখানে আবেগতাড়িত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই পদ্ধতিগতভাবে গবেষণা করতে হবে। কাজেই দেখা যায় গবেষক বা বিজ্ঞানীদের কাজের ধাপ প্রায় একই রকম। অবশ্য সমস্যার প্রকার ভেদে এ সকল ধাপগুলোর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হয়। তবে মোটামুটি ধাপগুলি নিম্নরূপ ঃ

সমস্যা সমাধান নির্ণয়ে কাজের ধাপ ঃ

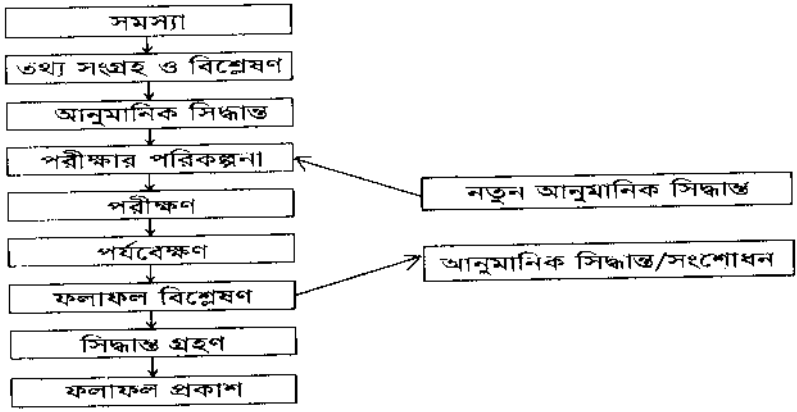

গবেষণার প্রকারভেদ (Types of Research) ঃ গবেষণার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, পদ্ধতিগতভাবে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ, তত্ত্বের বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এর লক্ষ্য। তাই গবেষণা কোন সমস্যার সমাধানকল্পে নিবেদিত। গবেষণাকে তথ্যবিদগণ প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন যথা -

১. মৌলিক গবেষণা (Basic or Fundamental research)

২. ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা (Applied research))

গবেষণাকে এভাবে দুইভাগে ভাগ করলেও মূলত কার্যপরিচালনার সময় উভয়ে উভয়ের কার্যে সহায়ক হয়ে উঠে।

১। মৌলিক গবেষণা ঃ মৌলিক গবেষণা হল বিশুদ্ধ গবেষণা। বিশুদ্ধ সমস্যা বা গণিতে যার কোন বিতর্ক চলে না। যা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত গবেষণাকে মৌলিক গবেষণা বলা চলে। এ গবেষণা মূলত তাত্ত্বিক গবেষণা। গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন এর মত মেধাবী গবেষকগণ জন্মগতভাবেই প্রতিভাবান, প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। অসীম যাদের জ্ঞান পিপাসা তারাই মৌলিক গবেষণা করে গেছেন তবে প্রচলিত তত্ত্বের পূর্ণব্যাখ্যার সুযোগ এ ধরনের গবেষণায় থাকে। মৌলিক গবেষণার লক্ষ্য ও সত্যের আবিস্কারই এর উদ্দেশ্য। যদি মৌলিক গবেষণা কেহ করতে চায় তবে প্রাকৃতিক উপাদান ও নিখুঁত সমস্যা বেঁচে নিতে হবে। প্রয়োজন হবে নিখুঁত পদ্ধতি, উত্তম উপকরণ, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ এবং বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ।

২। ফলিত গবেষণা ঃ ফলিত গবেষণা বাস্তব ক্ষেত্রে মানব কল্যাণের জন্য যেমন-সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রত্যক্ষভাবে যেসব সমস্যার সম্মুখিন হয় সেসব সমস্যার সমাধান দান করাই এর কার্যাবলী সংঘটিত হয়। মৌলিক গবেষণায় ব্যবহৃত কৌশলের কার্যকারিতা ঘটাতে ফলিত গবেষণার প্রয়োজন হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে ফলিত গবেষণা অত্যন্ত কার্যকর। কারণ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সংস্কার, দারিদ্র প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্যা আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে থাকে এবং জনগণ পূর্বকালের সমস্যা জর্জরিত পথেই এগোতে যেয়ে কোন সমাধানই খুঁজে পায় না। গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং উন্নয়ন তাদের নাগালের বাইরেই রয়ে যায়। এহেন অবস্থায় ফলিত গবেষণাই তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে উন্নতির পথ প্রদর্শন করাতে পারে। তাই উন্নয়নশীল দেশে ফলিত গবেষণার ফলাফলই বেশি প্রয়োজন। মৌলিক ও ফলিত উভয় ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যগুণসম্পন্ন ফলাফল অর্জন করা। তবে তড়িৎ ফললাভের জন্য স্বল্প ব্যয়ে যে গবেষণা করা হবে সমাজ, সংসার ও জীবনের প্রতিনিয়ত সমস্যার সমাধানকল্পে তা হবে ফলিত গবেষণা (Action research)। কারণ এর মাধ্যমেই সমাধান আনতে পারে বাজার মূল্যের অস্বাভাবিকতা, তরুণদের অপরাধ প্রবণতা, বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া, পাঠক্রমের উন্নয়ন, যুবকদের সন্ত্রাসী হয়ে উঠার কারণ নির্ণয়। এ সকল অসংগতির কারণ নির্ণয় করতে পারলে, এসব কারণের সমাধান আনা দুরূহ হবে না।

এতদ্ব্যতিত গবেষণাকে আরো কয়েকভাগে ভাগ করেছেন পণ্ডিতগণ। যেমন -

(ক) ঐতিহাসিক গবেষণা (Historical research)

(খ) পরীক্ষামূলক গবেষণা বা পরীক্ষাগার গবেষণা (Experimental or Laboratory research)

(গ) জরীপ গবেষণা (Survey research)

(ঘ) মূল্যায়ন গবেষণা (Evaluation research)

(ঙ) কার্যোপযোগী গবেষণা (Action research)

এ সকল বিভাজনের মধ্যে পরীক্ষামূলক গবেষণা কেবল ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সামাজিক বিজ্ঞানে এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজন খুবই কম। কারণ সামাজিক বিজ্ঞানের চলগুলোকে পরস্পর আলাদা করা দুরূহ। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মানব সম্পর্কের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। বাকীগুলো প্রকৃতি এবং মানব সমাজের উপর নির্ভরশীল। এমনকি এ সকল গবেষণা তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের কল্যাণে আসতে পারে।

উত্তম গবেষণার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হ্যারল্ড ফক্স তার "Critoria of Good Research" প্রবন্ধে বলেছেন – যে উত্তম গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে এবং সহজ সরল কথায় বর্ণনা করতে হবে। পদ্ধতি যথেষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করলে তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী গবেষকগণ নতুন গবেষণা করার ইঙ্গিত পাবে। উত্তম গবেষণা হবে সুসংবদ্ধ, ডিজাইন বা নক্সা উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করতে সহায়ক হবে এবং ফলাফল যাতে নৈর্ব্যক্তিক হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জেমস হ্যারণ্ড ফক্স আরো বলেছেন–গবেষক যেন তার স্বীকার উক্তিতে নিঃসঙ্কোচে তার কার্য ধারা, ডিজাইন, সীমাবদ্ধতার প্রভাব যা ফলাফলের উপর পরেছে তা প্রকাশ করেন। উপাত্তের বিশ্লেষণ কৌশল যাতে যথোপযুক্ত হয় তার জন্য উপাত্তের নির্ভর যোগ্যতা ও যথার্থতা সতর্কভাবে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। গবেষণার সিদ্ধান্ত নিতে হবে উপাত্তের উপর ভিত্তি করে। উপাত্ত পর্যাপ্ত সমর্থন করলে তার সীমার মধ্যে থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমরা একটা সমস্যা জর্জরিত জাতি। আজকে আমাদের গবেষণা বিশেষ করে সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। সে জন্য আজকে দরকার সামাজিক বিভিন্ন প্রকারের জরিপ যেমন–স্কুল জরিপ, মতামত, বাজার দর, দুর্ঘটনার কারণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুকদান ও গ্রহণ এবং এর সুদূর প্রবাহী ভয়ঙ্কর ফলাফল জরিপ বিদ্যালয় হতে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাবার সুফল ও কুফল, বৃদ্ধ নিবাশে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে জরিপ, শেয়ার বাজারে বিশৃঙ্খলতার কারণ, বউ-শাশুড়ী সম্পর্কের, করফাঁকি দেবার প্রবণতার উপর তথ্য সংগ্রহ, কিশোর, শিশুদের পথচ্যুত হবার পেছনে পিতামাতার অসতর্কতা, অফিস আদালতে ঘুষগ্রহণের উপর জরিপ, রাস্তাঘাট নোংরা করে তোলার পেছনে কাদের অসতর্কতা নিয়ে বিশ্লেষণ, কৃষি-ভূমি-কেমিক্যাল-সার ব্যবহারের ফলাফল, প্রাকৃতিক সার তৈরি করা নিয়ে গবেষণা ইতাদি শত শত সমস্যা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এ সকল সম্পর্কে গবেষণা করে প্রত্যেকটি নাগরিককে সচেতন হয়ে উঠতে হবে।

বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলেই হয়ে উঠবে বিজ্ঞান মনস্ক। প্রতিটি পরিবার যেন হয় গবেষণাগার। প্রত্যেকের মনে থাকবে সমস্যার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন। খুঁজবে উত্তর। উত্তর পেয়ে গেলেই সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশ তত বেশি গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার সমাধারকল্পে এগিয়ে যায়। আমাদের শহরের খোঁড়াখুড়ির শুরু হয় বর্ষা মৌসুমে, ময়লা ফেলে ড্রেন বন্ধ করা হয়। পৃথিবীর পুতিগন্ধময় শহর ঢাকা। হায়রে! আমার প্রাণ প্রিয় ঢাকা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ


১ থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল – ড. শাহজাহান তপন

২। শিক্ষা গবেষণা পরিচিতি – ড. মোঃ আশরাফ আলী

৩। Hillway, Tyrus. Introduction to Educational Research. Appletor Century Croft, 1959

৪ গবেষণার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ – অধ্যাপিকা ড. বেগম সামসুন নাহার।



ড. আকন্দ সামসুন নাহার
৮/বি, লেকরিপেল
১১/ডি, নায়েম রোড
ঢাকা

# চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্সরে

[ভূমিকা, আবিস্কারের ইতিহাস, এক্সরের প্রকৃতি, এক্সরের উৎস, এক্সরে উৎপাদনের শর্তসমূহ, ইলেকট্রনিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, লক্ষ্যবস্তু, কার্যকরী এক্সরে উৎপাদন, এক্সরে বৈশিষ্ট্যসমূহ, এক্সরের প্রকার, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্সরে]।

ভূমিকা ঃ এক্স-রে হচ্ছে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ। যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ০.০৫ থেকে ১০০ ডিগ্রি এ্যাংস্ট্রম ইউনিট। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন যে তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ উৎপন্ন হয় তাকে এক্স-রে বলে। এক্সরে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অদৃশ্য রশ্মি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স-রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আবিস্কারের ইতিহাস ঃ ১৮৯৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেল্ম কনরাড রন্টজেন অন্ধকার ঘরে ক্রোকস টিউবের উচ্চ ভোল্টেজ নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ করে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, টিউব থেকে কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড স্ক্রিনের উপর প্রতিপ্রভা হচ্ছে। তিনি সত্বর অনুধাবন করলেন যে, প্রতিপ্রভাটি হচ্ছে কোন এক অজানা রশ্মির কারণে। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে, রশ্মিটি কাঠ, কাগজ প্রভৃতি ভেদ করেও প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। উক্ত অদৃশ্য রশ্মিটিকে ভারী পদার্থ (সীসা) দ্বারা বাধা দেওয়া যায়। রন্টজেন খুব দ্রুতই চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর নতুন আবিষ্কৃত রশ্মিটির সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন। তিনি টিউব এবং কার্ডবোর্ড দ্বারা আবৃত বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড উভয়ের মধ্যে একটি হাত (সম্ভবতঃ তাঁর স্ত্রীর হাত) স্থাপন করে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি প্রথম বারের মত ফোরোস্কোপিক স্ক্রিনে হাড়ের প্রতিচ্ছবি দেখে রীতিমত অবাক হলেন।

রন্টজেন তাঁর নতুন আবিস্কৃত, অদৃশ্য, ভেদন ক্ষমতা রশ্মিটির নাম দিলেন "X-ray"। কারণ, "X" অক্ষরটি গণিতে অজানা রাশির জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্সরে আবিস্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে। রন্টজেন এর নাম এক্স-রে-এর সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে আছে। তাই পরবর্তিতে "Roentgenology" নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার প্রবর্তন হয়, যা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা প্রদানে এক্স-রে এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে।

এক্স-রে-এর প্রকৃতি ঃ একটি এক্সরে রশ্মিতে অনেক ধরনের রশ্মি থাকে। যেমন-সাধারণ আলো, অতিবেগুনি রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি এবং একই ধর্মবিশিষ্ট আরো অনেক রশ্মি। উপরোক্ত সব রশ্মিগুলোকে একত্রে তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ বলে। তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ হচ্ছে–স্পন্দমান ইলেকট্রনের উপর তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের ওঠানামা। তড়িৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র একে অপরের সমকোণে ওঠানামা করে (চিত্র ১)। সবধরনের তাড়িতচৌম্বক বিকিরণেরই (বেতার, তাপ, আলো, এক্স-রে, গামা-রে প্রভৃতি) গঠন একইরকম এবং তারা সবাই আলোর বেগে (১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল প্রতিসেকেন্ড) গমন করে। তাদের সবার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্ক বিভিন্ন। একটি তরঙ্গের দুইটি শীর্ষ বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। প্রতি সেকেন্ডে শীর্ষ বিন্দুর ওঠানামার সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক বলে কম্পাঙ্কের একক হচ্ছে হার্টজ। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমলে কম্পাঙ্ক বাড়ে। আমরা এটাকে অন্যভাবে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করতে পারি –

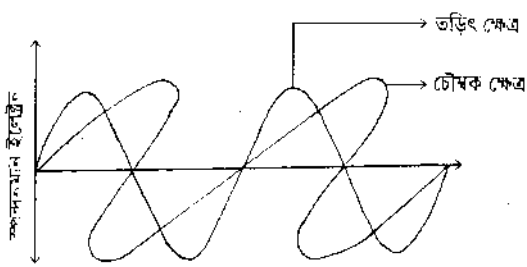

চিত্র-১ ঃ তড়িতচৌম্বক তরঙ্গ

$c = \nu\lambda$

এখানে,

$c$ = তরঙ্গবেগ (আলোর বা তাড়িতচৌম্বিক বিকিরণের বেগ)

$\nu$ = কম্পাঙ্ক (হার্টজ)

$\lambda$ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)

যেহেতু আলোর বেগ এবং তাড়িতচৌম্বক বিকিরণসমূহের বেগ একই। অতএব, উপরোক্ত সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, কম্পাঙ্ক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক।

এক্স-রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র। সাধারণ রেডিওগ্রাফিতে ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য হচ্ছে ০.১ থেকে ০.৫ ডিগ্রি এ্যাংস্ট্রম ইউনিট এদের কম্পাঙ্ক হচ্ছে $৩\times১০^{১৯}$ থেকে $৬\times১০^{১৮}$ হার্টজ এর মধ্যে। তাড়িতচৌম্বক বিকিরণসমূহ একটি ক্ষুদ্র শক্তি কণা হিসেবেও আচরণ করে। এই ক্ষুদ্র কণাকে ফোটন বা কোয়ান্টাম বলা হয়। এক্স-রেকে ফোটন হিসাবে দেখাই বেশি শ্রেয়।

এক্স-রে এর উৎস ঃ যখনি কোন দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন অকস্মাৎ বিকিরণের ভিতর দিয়ে যায় তখনি এক্স-রে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতিতে এই প্রক্রিয়াটি সবসময়ই হচ্ছে। তথা প্রকৃতিতে সবসময়ই এক্স-রে উৎপন্ন হচ্ছে এক্স-রে উৎপাদনের সব শর্তগুলো যদি আমরা পূরণ করতে পারি তবে আমরাও এক্স-রে উৎপন্ন করতে পারবো। এক্সরে টিউবের মাধ্যমে আমরা এক্স-রে উৎপন্ন করতে পারি। তাহলে উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, এক্সরে উৎপাদনের উৎস দুই প্রকার যথা -

১. প্রাকৃতিক এক্স-রে এবং

২. কৃত্রিম এক্স-রে।

যেহেতু, চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন এক্স-রে ব্যবহার করা হয় তাই তার উৎস তথা এক্স-রে টিউব নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম দিকে কোল্ড ক্যাথোড গ্যাস টিউব এক্সরে টিউব হিসেবে ব্যবহৃত হতো কিন্তু উক্ত টিউবে কিছু সমস্যা ছিলো তারপর ১৯১৩ সালে ডব্লিউ.ডি. কোলিডজ জেনারেল ইলেকট্রিক কম্পানি ল্যাবরেটরিতে এডিসন ইফেক্ট-এর উপর ভিত্তি করে হট ক্যাথোড ডাইউড টিউব নামে একটি নতুন এক্স-রে টিউব আবিস্কার করেন। একটি এক্স-রে টিউবের নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ থাকে (চিত্র-২) যথা -

১. একটি কাঁচ টিউব, যা টিউবকে বায়ুশূন্য করতে ব্যবহৃত হয়।

২. একটি ফিলামেন্ট, যা ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. একটি টার্গেট, যা অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. উচ্চ ভোল্টেজ, যা ক্যাথোডকে ঋণাত্মক আধান এবং অ্যানোডকে ধনাত্মক আধান প্রদান করে। এছাড়াও দুইটি সার্কিট থাকে। যথা -

১. একটি নিম্ন ভোল্টেজ হিটিং সার্কিট যা ক্যাথোডকে সরবরাহ করে।

২. একটি উচ্চ ভোল্টেজ হিটিং সার্কিট যা ক্যাথোড এবং অ্যানোডকে সরবরাহ করে

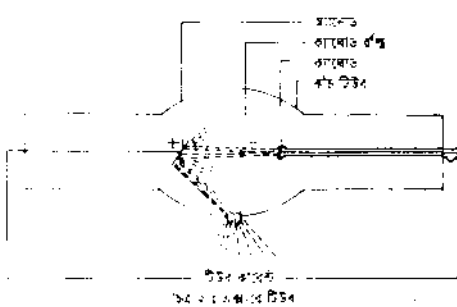

চিত্র ২ : এক্সরে টিউব

এক্স-রে উৎপাদনের শর্তসমূহ ঃ নিম্নলিখিত দুইটি কারণের যে কোন একটি ঘটলেই এক্সরে উৎপন্ন হয়। যখনই –

১. দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন অকস্মাৎ বিকিরণের ভিতর দিয়ে যায়, অথবা

২. কোন পরমাণুর বাইরের কক্ষ থেকে একটি ইলেকট্রন ভিতরের ফাঁকা কক্ষে লাফ দিয়ে নেমে আসে, তখনই এক্স-রে উৎপন্ন হয়। এক্সরে উৎপন্নের

জন্যে নিম্নলিখিত চারটি শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়। যথা –

১. ইলেকট্রনের পৃথিকীকরণ ঃ ফিলামেন্ট কারেন্ট দ্বারা ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করে বাইরের কক্ষপথের কিছু ইলেকট্রনকে পৃথক করে এক জায়গায় একত্রিত করা হয়, যা মেঘের মত সৃষ্টি করে এবং তাকে স্পেস চার্জ বলে। ইলেকট্রনের পৃথকীকরণকে থার্মিওন বলে। থার্মিওন এর প্রক্রিয়াটিকে থার্মিওনিক হামিশন বলে।

২. উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন উৎপাদন ঃ এখন যদি উচ্চ বিভব পার্থক্য এক্স-রে টিউবে প্রদান করা হয়, তবে ক্যাথোডে উচ্চ ঋণাত্বক আধান এবং অ্যানোডে সমপরিমাণ ধণাত্বক আধান উৎপন্ন হয়। ফলে একটি শক্তিশালী তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, যা স্পেস চার্জ ইলেকট্রনগুলোকে অতি উচ্চ গতিতে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে ধাবিত করে। এই ধাবমান ইলেকট্রনগুলোকে ক্যাথোড-রে বা টিউব কারেন্ট বলে। উক্ত ইলেকট্রনগুলোর গতি আলোর গতির অর্ধেকে গিয়ে পৌছায়।

৩. ইলেকট্রনের কেন্দ্রীভূতিকরণ ঃ ফিলামেন্টের গায়ে একটি ঋণাত্বক আধানবিশিষ্ট ধাতুর তৈরি ফোকাসিং কাপ লাগানো থাকে। যা অ্যানোডের গায়ে একটি নির্দিষ্ট ফোকাল স্পটে ইলেকট্রন প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে। ফোকাস যত ছোট হবে ইলেকট্রনের প্রবাহ তত সরু হবে ফলে এক্স-রে প্রতিচ্ছবি তত উজ্জল হবে।

৪. উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের গতিরোধ ঃ যখন উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলো টার্গেটে পতিত হয় তখন তাদের গতি শক্তি পরিবর্তিত হয়ে শক্তির অন্যান্য রূপ ধারণ করে। এই শক্তির অন্যান্য রূপের মধ্যে এক্স-রেও উৎপন্ন হয়।

ইলেকট্রনিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঃ যখন দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন টার্গেট পরমাণুর সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে তখন নিম্নবর্ণিত দুইটি প্রতিক্রিয়া ঘটে –

১. বিমস্ রেডিয়েশন ঃ যখন টার্গেট পরমাণুর শক্তিশালী ধনাত্বক নিউক্লিয়ার ক্ষেত্রের কাছ দিয়ে উচ্চ গতিসম্পন্ন ঋণাত্বক ইলেকট্রন যায় তখন ঐ ইলেকট্রনটি তার গতিপথ পরিবর্তন করে। ফলে ইলেকট্রনটি মন্থরিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে এবং তার কিছু গতি শক্তি হারায়। ঐ হারানো গতি শক্তিকেই সমপরিমাণ এক্স-রে হিসেবে পাওয়া যায় (চিত্র-৩)। উপরোক্ত প্রক্রিয়াটিকে ব্রিমস্ট্রহলাঙ বা ব্রেকিং রেডিয়েশন বলে। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এক্স-রে-এর পরিমাণ নিম্নবর্ণিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়

$h\upsilon = E_1 - E_2$

এখানে,

$h$ = ব্রিমস্ রেডিয়েশন

$\upsilon$ = প্লাঙ্কের ধ্রুবক (৬.৬২৬২×১০ $^{-৩৪}$ জুল/সেকেন্ড)

$E_1$ = ইলেকট্রনের প্রাথমিক শক্তি

$E_2$ = দিক পরিবর্তনের ফলে শক্তি হারানোর পর ইলেকট্রনের অবশিষ্ট শক্তি।

চিত্র ৩ ঃ ব্রিমস রেডিয়েশনের উৎপত্তি

সমস্ত উৎপাদিত এক্স-রে-এর মধ্যে ৯০% ব্রিমস্ রেডিয়েশন উৎপন্ন হয় যখন এক্সরে টিউবে ৮০-১০০ কিলোভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়।

২. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেডিয়েশন ঃ একটি পর্যাপ্ত শক্তি-সম্পন্ন ইলেকট্রন যখন টার্গেট পরমাণুর কক্ষপথের (K বা L) কক্ষপথ) কোন ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় তখন ঐ কক্ষপথটি ফাঁকা হয়ে যায়। উক্ত ফাঁকা জায়গা পূরণের জন্যে তার বাইরের কক্ষপথের কোন ইলেকট্রন এসে ঐ ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করে এবং কিছু শক্তি হারায়। ঐ হারানো শক্তিটুকুই এক্স-রে হিসেবে পাওয়া যায় (চিত্র-৪)। এই এক্সরে উৎপন্নের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথের জন্য নির্দিষ্ট। আর এই নির্দিষ্ট পরিমাণ এক্স-রে উৎপন্ন হয় বলে একে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেডিয়েশন বলা হয়। সমস্ত উৎপাদিত এক্স-রে-এর মধ্যে

১০% বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেডিয়েশন উৎপন্ন হয় যখন এক্স-রে টিউবে ৮০-১০০ কিলোভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। ৬৯ কিলোভোল্টেজের নীচে প্রয়োগ করা হলে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেডিয়েশন উৎপন্ন হয় না

লক্ষ্যবস্তু ঃ লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট মেটাল নির্ধারণের আগে দুটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আর তা হলো

১. টার্গেট মেটালের গলনাঙ্ক অনেক উচ্চ হতে হবে যাতে তা অতি উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে

২. এর উচ্চ পারমাণবিক সংখ্যা থাকতে হবে। কারণ –

- বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেডিয়েশন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন হবে

ব্রেমস্ রেডিয়েশনের পরিমাণ বাড়বে

টাংস্টেন একটি ধাতু যা উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করে। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক ৩৩৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৭৪। মলিবডেনাম টাংস্টেনের চারদিকে রিনিয়াম-টাংস্টেন দ্বারা আবৃত করে ঘূর্ণায়মান অ্যানোডের জন্য ব্যবহৃত হয়। যা এক্স-রে উৎপাদনে খুবই কার্যকর। টাংস্টেনের সাথে একটি তামার টুকরা লাগানো থাকে তাপকে প্রশমিত করার জন্য। কারণ তামা অত্যন্ত তাপ সু-পরিবাহী। কম শক্তিসম্পন্ন এক্স-রে উৎপাদনের জন্য মলিবডেনামের তৈরি অ্যানোড ম্যামোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয়। মলিবডেনামের গলনাঙ্ক ২৬১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৪২। রিনিয়ামের গলনাঙ্ক ৮১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৭৫।

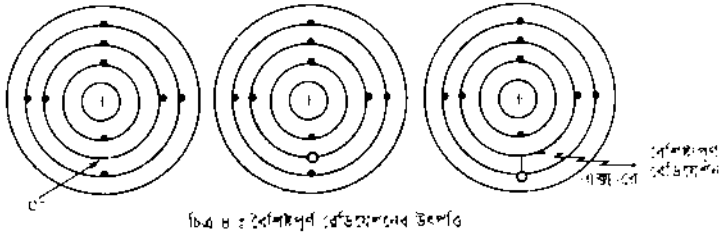


চিত্র ৪ ঃ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেডিয়েশনের উৎপত্তি

কার্যকরী এক্সরে উৎপাদন ঃ ক্যাথোডের খুব সামান্য অংশই এক্সরেতে রূপান্তরিত হয় আর বেশি অংশই তাপে পরিবর্তিত হয় কার্যকরী এক্স-রে উৎপাদনকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে, ইলেকট্রনের গতি শক্তি এক্সরেতে রূপান্তরিত হওয়ার হারকে কার্যকরী এক্স-রে উৎপাদন বলে।

কার্যকরী এক্স-রে উৎপাদন টার্গেটের পরমাণু সংখ্যা এবং প্রযুক্ত বিভবের সমানুপাতিক

এটাকে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো –

$E = K \cdot Z \times KV_p$

এখানে,

E = কার্যকরী এক্সরে উৎপাদনের হার

K = ধ্রুবক ($১ \cdot ১০^{-৯}$)

Z = টার্গেট এর পরিমাণবিক সংখ্যা

$KV_p$ = পীক কিলোভোল্টেজ।

উদাহরণস্বরূপ,

$E = ১ \cdot ১০^{-৯} \times ৭৪ \times ৮০$ (যেখানে Z =৭৪ (টাংস্টেন); $KV_p$ =৮০)

= ০.৬%

অর্থাৎ ইলেকট্রনের সমস্ত গতি শক্তির মাত্র ০.৬% এক্স-রেতে রূপান্তরিত হয় এবং বাকি ৯৯.৪% গতি শক্তিই তাপ উৎপন্ন করে। তাহলে টাংস্টেনের কার্যকরী এক্স-রে উৎপাদনের হার হচ্ছে ০.৬%।

এক্স-রে-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ এক্সরের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো –

১. এটি উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অদৃশ্য রশ্মি।

২. এটি আধান নিরপেক্ষ। এটি তরঙ্গ এবং কণা দু'রূপেই আচরণ করে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট।

৩. এক্সরে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ। তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এটি বিচ্যুত হয় না।

৪. এ রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।

৫. এক্সরে আলোর বেগে গমন করে।

৬. সাধারণ আলোর ন্যায় এক্সরের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন ও পোলারায়ন হয়ে থাকে।

৭. ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এর প্রতিক্রিয়া আছে।

৮. জিঙ্ক সালফাইড, বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড প্রভৃতি পদার্থে এ রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

৯. এটি আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ। গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এটি গ্যাসকে আয়নিত করে

১০. কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সামান্য পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে।

১১. সেকেন্ডারি এবং স্কেটার রেডিয়েশন উৎপন্ন করে।

১২. আয়নায়নের সাহায্যে রাসায়নিক এবং কোষীয় পরিবর্তন করে।

এক্সরের প্রকার ঃ ভেদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এক্স-রেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. কোমল এক্স-রে ঃ এটি নিম্ন শক্তিসম্পন্ন এবং কম ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি। এটি নিম্নবর্ণিতভাবে উৎপন্ন করা যায় –

- নিম্ন ভোল্টেজ প্রয়োগ করে
- কম পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট ফিল্টার ব্যবহার করে। যেমন – অ্যালুমিনিয়াম (Z =১৩)।

২. কঠিন এক্সরে ঃ এটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি। এটি নিম্নবর্ণিতভাবে উৎপন্ন করা যায় –

- উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে
- উচ্চ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ফিল্টার ব্যবহার করে। যেমন-তামা (Z=২৯)

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স-রে ঃ এক্স-রে-এর নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। তার মধ্যে আমরা শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে এক্স-রে-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা আগেই জেনেছি যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স-রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষায়িত যে শাখা রোগ নির্ণয়ে এক্স-রে এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে "Radiology" বলে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষায়িত যে শাখায় চিকিৎসা প্রদানে এক্স-রে-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে "Radiotheraphy" বলে

এক্স-রে একটি অতি উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অদৃশ্য রশ্মি এবং ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এর প্রতিক্রিয়া আছে। এটি অতি সহজে আমাদের নরম কলা ভেদ করতে পারে। কিন্তু আমাদের হাড় ভেদ করতে পারে না, কারণ, আমাদের হাড়ের বেশিরভাগই হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের তৈরি। আর তাই যখন ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর আমাদের শরীরের কোন অংশ রেখে এক্স-রে প্রযুক্ত করা হয় তখন আমাদের হাড়ের প্রতিচ্ছবি প্লেটের উপর দেখা যায়। নরম কলার প্রতিচ্ছবি দেখার প্রয়োজন হলে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কোন রেডিওপেক বস্তু (Contrast media) শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে রেডিওগ্রাফ নিলেই তা দেখা সম্ভব। আবার স্তনের প্রতিচ্ছবি দেখার জন্য কোমল এক্স-রে উৎপন্নকারী মেমোগ্রাফি মেশিন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক উন্নতমানের রেডিওগ্রাফিক মেশিনের ব্যবহার হচ্ছে। যেমন–সাধারণ রেডিওগ্রাফি, কম্পিউটেড রেডিওগ্রাফি, ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি, কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি, মেমোগ্রাফি প্রভৃতি।

এক্সরে আয়নায়নের সাহায্যে রাসায়নিক এবং কোষীয় পরিবর্তন করে। এটি কোষকে ধ্বংস করতে পারে

আর তাই যখন আমাদের শরীরের ক্যান্সার বাসা বাঁধে তখন এক্স-রে প্রয়োগ করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা হয়। তখন এক্সরে দীর্ঘ সময় ব্যাপী দেবার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্সরের কিছু ব্যবহার নিম্নে বর্ণনা করা হলো –

১. হাড়ের কোন সমস্যা যেমন-স্থানচ্যুতি, দাগ বা ফাটল, ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

২. শরীরের ভিতরে বাহিরের কোন বস্তু প্রবেশ করলে তার অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

৩. ফুসফুসের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

৪. পরিপাক তন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হায়।

৫. মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

৬. হৃদপিন্ডের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

৭. শরীরের অন্যান্য অঙ্গের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

৮. ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

*তথ্যপুঞ্জি ঃ*


১. The fundamentals of X-ray and radium physics-Joseph Selman-8th Edition.

২. মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান-ডঃ আলী আসগর সম্পাদিত।

৩. Bangla Academy English-Bangla Dictionary.

৪. Taber's Cyclopedic medical dictionary (Vol-II) 17th Edition.

৫. A Dictionary of Science - J.L.Sharma, P.L. Buldini-2nd Edition.



মোঃ হাবিবুর রহমান

বি.এসসি ইন রেডিওলজি অ্যাণ্ড ইমেজিং টেকনোলজি

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি

মহাখালী, ঢাকা ১২১২

# রোগের চিকিৎসায় পশুপাখির সাহচর্য

পশুপাখির সঙ্গে মানুষের সখ্যতা সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই। কখনো বার্তাবহ হিসেবে, কখনো যুদ্ধে, কখনোবা অন্যকোনভাবে মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে পশুপাখিরা। হাতি, ঘোড়া, ভালুক, কুকুর, পায়রা সকলেই মানুষের প্রিয় এবং বিশ্বস্ত সঙ্গীই শুধু নয়, হয়ে উঠে পরিবারের এক সদস্যও।

পশুপাখিদের সঙ্গে মানুষের এই যে স্বাভাবিক একটা সংযোগের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা কাজে লাগিয়ে সম্প্রতি মানুষের জীবনে পশুপাখির আর একটি ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। তা হলো জীবজন্তুর সাহায্যে বিভিন্ন রোগ, বিশেষ করে মনোরোগের চিকিৎসাও সম্ভব। অনেকদিন আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কুকুরদের গাইড ডগ, হেয়ারিং ডগ হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু এর বাইরেও যে জীবজন্তুরা মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে তা জানলে অবাক হতে হয়। এখন অ্যাগারেফোবিয়া অ্যাডিকশন, ডিপ্রেশন ও সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক রোগের চিকিৎসাতেও পশুপাখির সাহচর্য দারুন উল্লেযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। এসব রোগে আক্রান্ত রোগীদের দরকার সহানুভূতি ও যত্ন। আর ঠিক এই জায়গাতেই কার্যকরী হয়ে উঠেছে জীবজন্তুদের ভূমিকা। এদেরকে বলা হচ্ছে ইমোশনাল সাপোর্ট অ্যানিম্যালস আর এই কাজে লাগছে কুকুর, ঘোড়া, পাখি, খরগোশ এমনকি মাছও। এই নতুন ধরনের চিকিৎস' পদ্ধতি জন্ম দিয়েছে সাইকোথেরাপির এক নতুন বিভাগের, যার নাম ইকুইন অ্যাসিসটেড সাইকোথেরাপি বা ইএপি। এর উৎপত্তি কয়েক বছর আগে আমেরিকায় হলেও এখন ইংল্যান্ডেও চলছে এর জোর চর্চা।

ইএপি-তে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে ঘোড়ারা। ঘোড়া নাকি খুব সহজেই মানুষের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারে। সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিভাবে ঘোড়াদের ব্যবহার করা হয় ইএপি-তে? শুনলে অবাক হবেন, এই থেরাপি অবসাদগ্রস্ত মানুষকে ঘোড়ার পরিচর্যার দায়িত্ব দেয়া হয়। ঘোড়াকে খাওয়ানো থেকে স্নান করানো–সবই করতে হয় রোগীকে। কেন ? আসলে মানসিক রোগের অন্যতম মূল কারণ ভয়। ঘোড়ার যত্ন নিতে গিয়ে রোগী তার ভয়ের সম্মুখীন হয়। ক্রমাগত পরিচর্যা করতে করতে ভয় কেটে গিয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। গত প্রায় দু'বছর ধরে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছে এই থেরাপি। ফল? জোড়া লাগানো গিয়েছে অনেকগুলো ভেঙ্গে যাওয়া পরিবার। ছাড়ানো গিয়েছে নেশাগ্রস্তদের নেশা। কমে যাচ্ছে রাগ ও অবসাদ অর্থাৎ সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে মানুষকে।

ঘোড়া সব থেকে কার্যকরী ভূমিকা নিলেও মানুষের বিশ্বস্ততম এবং নিকটতম বন্ধু কিন্তু কুকুরই। কুকুররা নাকি তাদের প্রভুর শরীরে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের অস্তিত্ব বুঝে ফেলতে পারে। ভাবা যায় ? সারমেয়দের সাহচর্য কোলেস্টরলের মাত্রা কমায়। স্বাভাবিক রাখে রক্ত চাপ। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, খুব যন্ত্রনাদায়ক রোগগুলোর ক্ষেত্রে কুকুরের উপস্থিতি রোগীর কষ্ট লাঘব করে অনেকটাই। ইসরায়েলের বিজ্ঞানীদের করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও কুকুরের উপস্থিতি রোগীকে শান্ত রাখে। শুধু তাই নয়, রোগীরা চনমনে হয়ে ওঠে কুকুরের সাহচর্যে। দেখা গেছে যারা মেন্টাল অ্যারিথমেটিক বেশি করেন; তাদের ঘরে একটা কুকুর থাকলে পারফরম্যান্স ভালো হয়। মানসিক পীড়ন অনেক কমে যায়। অ্যাগারোফোবিয়া বা খোলা জায়গায় যেতে ভয় যাদের, কিংবা লো সেল্ফ এস্টিম যাদের, তাদের ক্ষেত্রেও দারুন কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে পশুপাখিরা। কুকুর, খরগোশ বা পাখি নিয়ে শপিং বা বেড়াতে বেরুলে বাড়ে সেল্ফ এস্টিম। ট্রমা বা মানসিক আঘাতের পরেও মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে পশুপাখির সঙ্গ।

কীভাবে জীবজন্তুর সাহচর্য সুস্থ করে তুলছে মানসিক রোগীদের ? আসলে মানসিক রোগীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে দরকার যত্ন ও সহমর্মিতা। তাই অন্য একটি প্রাণীকে ভালোবাসলে তারা যখন নিঃস্বার্থভাবে তার প্রতিদান দেয়, তখন এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের স্নেহ ভালোবাসার মূল্যায়ন পান। এই

কারণে পশুপাখিদের দেহের কোমল স্পর্শ দারুনভাবে উপশমকারী হয়ে ওঠে। এই ব্যাখ্যা করেছেন লন্ডন মেডিক্যাল সেন্টারের সাইকোলজিস্ট ইসিও কলিনস।

কোনো সন্দেহ নেই যে, চিকিৎসার জগতে সম্পূর্ণ এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ইএপি। তবে বিজ্ঞানীরা এখানে থেমে নেই। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন শুধুমাত্র জীবজন্তুর সাহচর্য মানুষকে রক্ষা করবে দূরারোগ্য ব্যধির হাত থেকে।

নিশাত তাসনিম সাফা
চৌদ্দপায়া, ৩০নং ওয়ার্ড
থানা-মতিহার, ডাকঘর-বিনোদপুর
রাজশাহী

# বিজ্ঞান চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ

ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর নানা সৃষ্টির বিশালতার সূত্র পরিপূর্ণ জানার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের সংবাদ প্রচার করতে পারে। যতই সে জানতে থাকে ততই তার কাছে অজানা বিষয় এসে হাজির হয়। গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর পৃথিবী একটি গ্রহ; যে গ্রহে একমাত্র প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। মানুষ এই গ্রহের বাসিন্দা যে প্রাণের উৎপত্তির বহুকাল পরে তার আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। এই মানুষের চিন্তা শক্তির বিশালতা তাকে এক অদৃশ্য জগতে নিয়ে গেছে। এই রহস্যময় জগতের বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য সে যুগ যুগ ধরে কর্মপ্রয়াস চালিয়ে গেছে। মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তা তার একদিনের সৃষ্টি নয় বরং বহুপথ পাড়ি দিয়ে অক্লান্ত সাধনার পর সে আজকের বিশ্ব সমাজ নির্মাণ করেছে। প্রাচীণকালে মানুষ বনের হিংস্র প্রাণী এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ ভয়ভীতি থেকে বাঁচার জন্য যখন প্রকৃতির কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে তখন সে প্রকৃতির বৈরী পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। এ মানুষ বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং শিকার করার জন্য পাথরের হাতিয়ার তৈরি করেছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং ভয়ভীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে গুহার ভিতর বসবাস করেছে। গুহাবাসী মানুষ তার চিন্তা দ্বারা ঘরবাড়ী বানাতে শিখেছে। কিন্তু মাটি, কাঠের তৈরি ঘর-বাড়ী এবং পাতার ছাউনি জলোচ্ছাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। বারবার ঘর বেঁধে যখন নিরাস হয়েছে তখন শক্তভাবে ঘর তৈরি করার মনস্থির করেছে। পাথর দিয়ে, মাটি পুড়িয়ে শক্ত করে, কাঠ চিরে গৃহ নির্মাণ করতে শিখেছে। এই নির্মাণ শৈলী ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মানুষ জগতে আসার পর থেকে বিরাট বিশ্ব চরাচর দেখে বিস্মিত হয়েছে এবং এই বিস্ময় থেকে প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। জগৎ কত আগে সৃষ্টি? কে সৃষ্টি করল? এটা কি চিরকাল স্থায়ী থাকবে না ধ্বংস হবে? নিজের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করেছে কে আমি? কোথা থেকে এলাম? কোথা আমার যাত্রা শেষ? মানুষের এই অলঙ্ঘনীয় প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায় শতাব্দির পর শতাব্দির চলে গেছে। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আকাশ কেন নীল? এটা কত দূরে অবস্থিত? প্রভৃতি আর এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেয়ার চেষ্টায় আবির্ভাব ঘটেছে দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের। মানুষ অফুরন্ত সম্ভাবনা এবং সমাজের ভিতর জন্মগ্রহণ করেছে। তার উদ্ভাবনী শক্তি তাকে জাগতিক কাঠামো পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে। সে তার সম্ভাবনার মাত্র ৪/৫ ভাগ ব্যবহার করে। এই সামান্য সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সে কোথায় যাচ্ছে? প্রকৃতির সম্পদের সাথে তার ভিতরের সম্ভাবনা সমন্বয় ঘটিয়ে সে তার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই প্রয়োজনীয়তা তাকে গতিশীল করেছে। মানুষের আগুন আবিস্কার সভ্যতার ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা। এই আগুনের তাপ দ্বারা ধাতু গলাতে শেখা এবং চাকা তৈরি করা সভ্যতার চাকাকে যে সামনের দিকে চালিয়েছে যার কারণে আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। মুদ্রণযন্ত্র আবিস্কার, কাগজ তৈরি করে তথ্য জগতে মানুষ বিপ্লব সাধন করেছে। আদিম মানুষ স্বপ্ন দেখতো পাখির মত আকাশে উড়তে এবং মাছের মত সাঁতার কাটতে। সে তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্বপ্ন থেকে বাস্তবায়ন করার জন্য আজ আবিস্কার করেছে যন্ত্র, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, ডিজেল ইঞ্জিন, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যা তার গতিকে বৃদ্ধি করেছে। কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ আবিস্কার মানুষের সভ্যতাকে অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষ একে একে আবিস্কার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্ব বিবেককে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহুল করে তুলেছে। বৈদ্যুতিক বাল্ব, এয়ার কন্ডিশন, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর, হিটার এমনকি পকেটের কলম থেকে শুরু করে হাতের ঘড়ি পর্যন্ত আবিস্কার করে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন মিটাচ্ছে।

বিভিন্ন কারখানার মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী রান্নার যন্ত্রপাতি ও উপাদান মানুষের রসনার চাহিদাকে বহুমাত্রিক করেছে। এই বিজ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে শিক্ষায়, চিকিৎসায়, কৃষিক্ষেত্রে এমনকি সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা পর্যন্ত বিস্তৃত। জিন বিজ্ঞানে ক্লোনিং, কৃত্রিম মানুষ রোবট, হাবল মহাকাশ দূরবীণ, দ্রুত গতিসম্পন্ন যান আবিষ্কার করে জ্ঞানের জগতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফলতাই মানুষ জীবনকে পর্যন্ত জয় করতে চলেছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচার ব্যবস্থা, এক্সরে, অতিবেগুনী রশ্মি, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, উন্নতমানের ওষুধ আবিষ্কার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে করেছে সমৃদ্ধ। উৎপাদনে আদিম মানুষ এবং আধুনিক মানুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষ তার আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মাটির গভীর থেকে পানি বের করে ফসল ফলানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কীটনাশক ওষুধ আবিষ্কার করে পোকামাকড় দমন করেছে। প্রাচীন কাঠের লাঙ্গলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নতমানের কলের লাঙ্গল, আবর্জনা, পঁচা গোবর সারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক সার। কৃষিতে তথ্য বিপ্লবের মাধ্যমে ফার্মের আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮ শতকের গোড়ার দিকে একজন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক যে কয়জন মানুষের জন্য খাদ্য এবং সূতা উৎপাদন করত এখন প্রত্যেক কৃষক তার ১৫ গুণ বেশি উৎপাদন করে। উৎপাদিত দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসেবে শিল্প কারখানায় ব্যবহার করে মানুষ উন্নত ভোগ্যসামগ্রী তৈরি করে নিজের প্রয়োজন মিটানোর পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্যের দ্বারকে উম্মোচন করেছে।

আজ তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে মানুষ বিস্মিত হয়েছে। ২১ শতককে এক সঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায় প্রযুক্তির যুগ হিসেবে। কম্পিউটার যোগাযোগ যাত্রাপথকে অগ্রসর করেছে। কম্পিউটার যে মৌলিক ইউনিট ট্রান্সমিটার তার উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। খুব শীঘ্রই ১০০ মিলিয়ন ট্রান্সমিটার একটা আঙ্গুলের নখের সাইজের চীপে পাওয়া যাবে। জাপানের একটি অনুসন্ধান দল অপটিক্যাল ইন্টিগেটেড সার্কিট সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করছে যা সিলিকন চিপস থেকে ১০০০ গুণ দ্রুত হবে। একজন আমেরিকান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশারদ Ray Kurjwell তার মতে ২০৯৯ সালে সবচেয়ে সস্তা একটি কম্পিউটার ও সমগ্র বিশ্বের মানুষের সম্মিলিত স্মরণশক্তির চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশি স্মরণশক্তি ধারণ করতে সক্ষম হবে। গোটা বিশ্বকে তারের মালায় গেঁথে ফেলা হচ্ছে। গ্লোবাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে ফাইবার অপটিক ও স্যাটেলাইট লিং-এর মাধ্যমে যুক্ত করছে। জাপান আশা করছে এ কাজটি ২০১৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারবে। অদ্ভুত এক বিন্যাস আমরা দেখবো Wireless terminal cellulor networks under sea fiber-optic cables. Satellite system GCS internet-এর মহা সংমিশ্রণের মাধ্যমে। Compuserve networks ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যার মাধ্যমে আপনি বিল পরিশোধ করতে পারেন। হাজার হাজার দোকান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শপিং করতে পারেন। বিমানের বুকিং ও টিকেট ক্রয় করতে পারেন। বড় বড় রিসার্চ করতে পারেন। ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, বিশ্বকোষ পাঠ ইত্যাদি শুধু আপনার বাসায় বসে আপনার কম্পিউটার থেকে করতে পারেন। খুব শীঘ্রই এমন অবস্থা হতে যাচ্ছে যে, পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন লোকের কাছে তথ্য পৌঁছে যাবে।

মানুষ তার কল্পনা এবং স্বপ্নের বিষয়কে আজ কাজে লাগিয়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এই মানুষ জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সন্নিবেশিত। সে স্বভাবত কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ভোগ সুখ দ্বারা চালিত। তার জৈবিক প্রবৃত্তি তাকে নিয়ন্ত্রন করে। অপ্রাপ্তি উল্লাস ভোগ সুখ তাকে অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সুপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের ফলে মানুষ মানুষের জন্যে কাজ করে, সেবা করে, দুঃখে সান্ত্বনা পেয়ে অপরের আত্মার আর্তনাদ নিজের আত্মার মনে করে। মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। মানুষ যদি সুপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না করে তাহলে তার ভিতরে কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে পাশবিক পর্যায়ে নিপতিত হবে। কিন্তু মানুষ দেবতাও না আবার পশুও না। জাগতিক প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে জ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান আত্মিক ব্যবহারিক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমে মানুষ ব্যবহারিক কার্য সমাধা করতে পারে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাড়া যদি তার মনে না জাগে অথবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার যদি সে না জানে তাহলে গতিশীল বর্তমান বিশ্বের তুলনায় পিছিয়ে যাবে। কোন জাতি যদি জ্ঞান

বিজ্ঞানের সাথে পাল্লা না দেয়, নিজকে জগৎ বিমুখ রেখে শুধু মানবিক গুণাবলীর চর্চা করতে থাকে তাহলে বিচ্ছিন্ন উপজাতির মত তার অবস্থা হবে। বিজ্ঞানের জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেন নিরলস সাধনার ফলে, তারা রাজনীতির বাহিরে নয়। নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের ভিতর বসবাসকৃত জনমন্ডলীসহ সমগ্র বিশ্ব রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাসে দেখা দেয় এক এক সভ্যতা নিজেদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য সভ্যতার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। আজ শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়গত, জাতিগত কতৃত্ব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আগেকার দিনে মানুষ অস্ত্র হিসেবে আঁচড়া, বাটালি, তুনপুন, লাঠি, বর্শা, তীর, পাথর প্রভৃতি ব্যবহার করতো। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সভ্যতায় এসে এমন বোমা আবিস্কার করছে যার দ্বারা এক শহরের মানুষকে জ্বালিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমানবিক বোমার ব্যবহার জগৎবাসীকে হতভম্ব করে ফেলেছে। আজ প্রতি মিনিটে ২০-৩০ লাখ ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। এ খাত মানুষ হত্যার খাত, সৃষ্টি ও সভ্যতাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে ফেলার খাত। সত্য, শিব, সুন্দর মানব জীবনের তিনটা মহৎ আদর্শ। মানুষের প্রযুক্তির সম্ভাবনা এবং অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার আজ যাত্রা অন্ধকার গলি পথে। বিজ্ঞান মানুষের কাছে এসেছে অদম্য শক্তিধর ঘোড়ার মত। এ ঘোড়ার পিঠে উঠে মানুষ যাত্রা করে গন্তব্যের আশায়। কিন্তু গন্তব্যে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা দেখা যায় না। কারণ ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাগাম দরকার। লাগামহীন ঘোড়ারূপ বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে বিবেক ও নিশ্চয়তা। বিজ্ঞানকে সুপথে পরিচালনার জন্য প্রজ্ঞা প্রয়োজন। আর এই প্রজ্ঞা মূল্যবোধের আলোকে গড়ে উঠে। মূল্যবোধের চর্চা না থাকার কারণে আজ মানুষের বহুমাত্রিক ক্ষুধা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে চলেছে। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক–এই শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে সভ্যতাকে জঙ্গলে পরিণত করতে চলেছে। মানুষের ভিতর অবিশ্বাস ও হিংস্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পাশবিকতার হাত থেকে সমাজ এবং সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিজ্ঞান এবং মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজ বিশ্ববাসীকে তাই বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি মূল্যবোধের চর্চা করে শান্তিপূর্ণ আবাসভূমি গড়ে তুলতে হবে।

শহিদুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক, গবেষক
প্রভাষক
ইস্পাহানী ডিগ্রী কলেজ
ঢাকা

# ধাতু এবং জীবন

ভূ-পৃষ্ঠ গঠনে ব্যবহৃত মৌলগুলোর সাথে জীবকোষ গঠনে ব্যবহৃত মৌলগুলোর পার্থক্য খুবই প্রকট। সকল জীবিত বস্তুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পরিবেশ থেকে অল্প কয়েকটি বাছাইকৃত মৌলের সমন্বয়ে তাদের সৃষ্টি। ভূ-ত্বকের ৯৯% উপাদান অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম এবং আয়রন হলেও জীব কোষের ৯৯% উপাদান হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন। কেবল অক্সিজেনের ক্ষেত্রে জীব এবং ভূ-ত্বকে আনুমানিক সমপরিমাণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মানব দেহ প্রধানত বিভিন্ন জটিল জৈব অণু [প্রোটিন, নিউক্লিইক এসিড, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট] এবং পানি দ্বারা গঠিত যার আনুমানিক ৯৮% উপাদান হলো চারটি অধাতব মৌল অক্সিজেন (৬৫%), কার্বন (১৮%), হাইড্রোজেন (১০%) এবং নাইট্রোজেন (৩%)। দেহ গঠনের অবশিষ্ট উপাদানগুলো ফসফরাস (১.১%), সালফার (০.২৫%), ক্লোরিন (০.১৫%), আয়োডিন (<০.০০১%), ফ্লোরিন (<০.০০১%), ব্রোমিন (<০.০০১%), ইত্যাদি কতিপয় অধাতব মৌল এবং বাছাইকৃত কয়েকটি ধাতু। চারটি ধাতু তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে উপস্থিত থাকে, এরা হলো সোডিয়াম (০.১৫%), পটাশিয়াম (০.৩৫%), ক্যালসিয়াম (০.৩৫%) এবং ম্যাগনেশিয়াম (০.০৬%); এদের সর্বমোট পরিমাণ আনুমানিক ০.৯১% অর্থাৎ ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের শরীরে এ চারটি ধাতুর মোট ওজন হয় প্রায় ৬৪০ গ্রাম মাত্র। এদেরকে প্রধান ধাতু (bulk metals) বলা হয়। আয়রন (০.০১%), ম্যাংগানিজ (০.০০২%), কোবাল্ট (০.০০২%), কপার (০.০০২%), জিঙ্ক (০.০০২%), মলিবডিনাম (০.০০২%), ক্রোমিয়াম (০.০০০১%) এবং নিকেল (০.০০০১%) ধাতুগুলো অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের শরীরে এদের সর্বমোট ওজন ১৫ গ্রাম থেকেও কম। পরিমাণে এত কম হলেও জীবন রক্ষার জন্য এদের এরূপ উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এরা অত্যাল্প ধাতু (trace metals) বলে পরিচিত। কিন্তু এ ধাতুগুলো তাদের উল্লেখিত পরিমাণ থেকে বেশি পরিমাণে উপস্থিত থাকলে তারা শরীরের জন্য বিষ হয়। আবার শরীরের জন্য প্রয়োজন নয় এমন কোন ধাতু শরীরে প্রবেশ করলে তারাও বিষের কাজ করে। শরীরের প্রতি ধাতুর বিষক্রিয়াকে ধাতু দূষণ (metal poisoning) বলা হয়।

শরীর ওজনের প্রধান অংশ (৬০-৭০%) পানি থেকে আসে এবং শরীর গঠনের দুটি প্রধানত উপাদান অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের বেশির ভাগ এ পানি গঠনেই ব্যবহৃত হয়। কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, কখনো নাইট্রোজেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সালফার যুক্ত হয়ে শরীরে উপস্থিত জৈব অণুসমূহ গঠিত হয়। ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের বেশি অংশ ক্যালসিয়াম ফসফেট হিসেবে হাড় এবং দাঁত গঠনে ব্যবহৃত হয়, ফসফরাসের অবশিষ্ট অংশ নিউক্লিইক এসিড, DNA এবং RNA গঠন করে। সরল অজৈব ক্যাটায়ন হিসেবে $Na^+$, $K^+$, $Mg^{2+}$, $Ca^{2+}$ এবং অ্যানায়ন হিসেবে $Cl^-$, $PO_4^{3-}$, $HCO_3^-$ জীবকোষের তরলে দ্রবীভূত থাকে। কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম চালনার জন্য এসব আয়নের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্নায়ুতন্ত্রের প্রণোদনা এবং পেশী সংকোচন (nurve impulse and muscular contraction) এদের সঠিক ইলেক্ট্রোলাইটিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। $Fe^{2+}$, $Mg^{2+}$, $Ca^{2+}$, $Co^{3+}$, $Zn^{2+}$, $Cu^{2+}$ ইত্যাদি সরল আয়ন অনেকগুলো বিশালাকার অণুতে (macromolecules) [উদাহরণঃ রক্তের হেমি গ্রুপে $Fe^{2+}$, ক্লোরোফিলে $Mg^{2+}$ এবং ভিটামিন $B_{12}$ অণুতে $Co^{3+}$] উপস্থিত থেকে তাদের সক্রিয় করে। নিচে রক্তের হেমোগ্লোবিনে $Fe^{2+}$ আয়নের ভূমিকা দেখানো হলো ঃ

$$Hb–Fe + O_2 \rightarrow Hb–Fe←O_2$$

ফুসফুসে রক্ত এসে এভাবে অক্সিজেনযুক্ত হয়ে সারাদেহের কোষসমূহে অক্সিজেন পৌঁছে দেয় এবং অক্সিজেনবিহীন রক্ত পুনরায় ফুসফুসে চালিত হয়ে নতুন করে অক্সিজেন যুক্ত হয়।

$$Hb\text{–}Fe \leftarrow O_2 \rightarrow Hb\text{–}Fe + O_2$$

জীবকোষে উপস্থিতি গ্লুকোজের সাথে মুক্ত অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কার্বন-ড্রাই-অক্সাইড, পানি এবং শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তিই দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাত্র দুই মিনিটকাল যদি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ থাকে তাহলে জীবন প্রক্রিয়া থেমে যায় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি}$$
(গ্লুকোজ)

উদাহরণটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের শরীরে আয়রণের উপস্থিতি এত কম (০.০১%) হলেও জীবন প্রক্রিয়ায় এর ভূমিকা কত বেশি। অন্যান্য ধাতুগুলোও জীবন রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের শরীরে কোবাল্টের পরিমাণ অতি নগণ্য, ০.০০২% থেকেও কম, ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের দেহে ১ গ্রাম থেকেও কম কোবাল্ট উপস্থিত থাকে। এটি ভিটামিন $B_{12}$ এর একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, ভিটামিনটির অভাব হলে শরীরে রক্ত সৃষ্টি বাধাগ্রস্থ হয়, রক্তে লোহিত কণিকা (RBC) কমে যায় এবং শ্বেত কণিকা (WBC) বৃদ্ধি পায় এবং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তারগণ রোগীকে সঠিক মাত্রায় ভিটামিন $B_{12}$ খেতে পরামর্শ দেন; কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অহেতুক অধিক মাত্রায় ভিটামিন $B_{12}$ সেবন করলে শরীরে কোবাল্টের বাড়তি উপস্থিতি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ল্যাবরেটরী এবং যানবাহন থেকে অনেক ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ বাতাস, পানি এবং মাটির সাথে মিশে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে। এরূপ দূষিত পরিবেশে সকল উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদভোজী প্রাণীদেহে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে। আবার খাদ্যচক্র এবং শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের শরীরেও এরা ঢুকে যায়। বিষাক্ত ধাতু শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু কয়েকটি বিষাক্ত গ্যাস শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে কয়েক মিনিটেই মৃত্যু ঘটাতে পারে। কার্বনমনোক্সাইড এরূপ একটি গ্যাস। শরীরে প্রবেশ করলে এটি রক্তের হেমোগ্লোবিনে অবস্থিত আয়রনের সাথে সন্নিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে একটি মজবুত বাঁধন সৃষ্টি করে যা সহজে ভাঙ্গে না। ফলস্বরূপ রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, যার নিশ্চিত পরিণতি হলো মৃত্যু।

$$Hb\text{–}Fe + CO \rightarrow Hb\text{–}Fe \leftarrow CO$$

মানব দেহ প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার রাসায়নিক/প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে জীবন প্রক্রিয়া চালু রাখে। এ বিক্রিয়াগুলোর জন্য অনেক ধরনের এনজাইম এবং মেটালোএনজাইমের প্রয়োজন। এনজাইম হলো অতি জটিল জৈব অণু এবং অনেকগুলো এনজাইমকে সক্রিয় করার জন্য তাদের সাথে কতিপয় নির্দিষ্ট ধাতু যুক্ত থাকে। এদেরকে মেটালোএনজাইম বলে। যেমন-কোরোফিল এনজাইমে একটি $Mg^{2+}$ আয়ন উপস্থিত থাকায় তা একটি মেটালোএনজাইম। প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে এনজাইম এবং মেটালোএনজাইমগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ এ-রূপ একটি বিক্রিয়ার উদাহরণ।

সালোকসংশ্লেষণ ঃ

$$6CO_2 + 6H_2O + \text{আলোক শক্তি} \xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$
(গ্লোকোজ)

উদ্ভিদের সবুজ পাতায় মেটালোএনজাইম কোরোফিল উপস্থিত থাকে বলেই উদ্ভিদ এ বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। উদ্ভিদ দেহে অনেকগুলো গ্লুকোজ অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে স্টার্চ এবং সেলুলোজ পলিমার গঠন করে।

$$2n\,C_6H_{12}O_6 \rightarrow [C_6H_{10}O_5]_n + [C_6H_{10}O_5]_n + 2n\,H_2O$$
(স্টার্চ) (সেলুলোজ)

স্টার্চ মানুষের প্রধান খাদ্য এবং তৃণভোজী পশুদের খাদ্য হলো সেলুলোজ। আবার উদ্ভিদের দেহ গঠনের প্রধান উপাদানও সেলুলোজ। মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীদেহে এ এনজাইমটি না থাকায় তারা এ বিক্রিয়া ঘটাতে

পারে না। উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগত বাঁচিয়ে রাখতে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর অবদান কত বেশি তা এ উদাহরণটি থেকেই বুঝা যায়। সুস্থ মানুষের শরীরে জৈবিক প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য বিভিন্ন ধাতুর ভূমিকা নিচে আলোচিত হয়েছে।

সোডিয়াম ঃ রক্তরস (blood plasma) এবং বিভিন্ন জীবকোষ আবরণের বহিঃস্থ তরলে $Na^+$ আয়নই হলো প্রধান ক্যাটায়ন। একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষ প্রতিদিন তার খাবার থেকে কয়েক গ্রাম $Na^+$ আয়ন গ্রহণ করে। ঘামের মাধ্যমে শরীরে লবণের সাম্যতা বজায় থাকে। অতিরিক্ত $Na^+$ আয়ন গ্রহণ করলে তা ঘামের সাথে বেড়িয়ে যায়, কিন্তু সব আয়ন (যেমন $Fe^{2+}$ আয়ন) এভাবে নির্গত হয় না। তবুও খাবারের সাথে প্রতিদিন অতিরিক্ত লবণ (NaCl) গ্রহণ করলে তা উচ্চ রক্ত চাপের কারণ হতে পারে। জীবকোষের বহিঃস্থ তরলের অসমোটিক চাপ (osmotic pressure) নিয়ন্ত্রণ, কোষকলাসমূহের মাঝখানে পানির পরিমাণ সঠিক রাখা, রক্তচাপ নির্ধারণ, বাইকার্বোনেট বাফার সিস্টেমের মাধ্যমে কোষের বহিঃস্থ তরলের এসিড-ক্ষার মাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি কাজে $Na^+$ আয়নের ভূমিকা রয়েছে। স্নায়ু এবং মাংসপেশীর সংবেদনশীলতা এবং হার্ট (heart) এর কাজ স্বাভাবিক রাখার জন্য শরীরে সঠিক ঘনমাত্রায় $Na^+$ আয়নের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

পটাশিয়াম ঃ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে কয়েক গ্রাম পটাশিয়াম আয়ন উপস্থিত থাকে। প্রায় সব খাদ্যের মধ্যেই এ আয়ন থাকে। প্রয়াজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করলে এ আয়নও সোডিয়াম আয়নের মত শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে বেড় হয়ে যায়। আমাদের শরীরে সব কোষ আবরণের অন্তঃস্থ তরলে এ আয়নের ঘনমাত্রাই সবচেয়ে বেশি। কোষের অসমোটিক চাপ এবং বৈদ্যুতিক বিভব নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সঠিকভাবে হার্ট সংকোচনের কাজ বজায় রাখার জন্য $K^+$ আয়নের সঠিক ঘনমাত্রা অত্যাবশ্যক। স্নায়ুতন্ত্র এবং মাংস পেশীর বৈদ্যুতিক বিভব এবং তঞ্চন ক্রিয়া $Na^+$ এবং $K^+$ আয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্যালসিয়াম ঃ মানব দেহের সকল কোষকলায় (human tissues) ক্যালসিয়াম একটি সাধারণ আয়ন। ক্যালসিয়াম ফসফেট হিসেবে দাঁত এবং হাড় গঠনে এটি ব্যবহৃত হয়। রক্তেও ক্যালসিয়াম আয়ন উপস্থিত থাকে, মাংসপেশীর সংকোচন ক্রিয়া এ আয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দুধ, পনির, সবুজ পাতাবহুল সব্জি ইত্যাদি থেকে আমরা যথেষ্ট ক্যালসিয়াম পাই।

ম্যাগনেসিয়াম ঃ আমাদের হাড় এবং অধিকাংশ কোষকলায় (tissues) ম্যাগনেসিয়াম থাকে। অনেকগুলো মেটালোএনজাইমেও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন পাওয়া যায় (উদাহরণ ঃ ক্লোরোফিল)। পটাশিয়ামের পর ম্যাগনেসিয়াম আয়নই কোষের অভ্যন্তরস্থ তরলে ক্যাটায়ন হিসেবে সর্বাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে। আমাদের দেহে $Mg^{2+}$ আয়নই সর্বাধিক সংখ্যক এনজাইমকে সক্রিয় করে। মাংসপেশীর সংকোচন প্রক্রিয়া ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম দুটি আয়ন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। DNA এবং RNA-এর ত্রিমাত্রিক কাঠামোকে সুস্থিত রাখতে $Mg^{2+}$ আয়ন সাহায্য করে। ভাত, রুটি, দুধ, পনির ইত্যাদি থেকে আমরা যথেষ্ট ম্যাগনেসিয়াম পেয়ে থাকি। চারটি প্রধান ধাতু সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়ন দ্বারা কোষের অভিস্রবণ (osmosis) ক্রিয়া এবং দেহের এসিড-ক্ষার সাম্যতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আয়রন ঃ রক্তে অবস্থিত অক্সিজেন পরিবহণকারী দুটি প্রোটিন হেমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিন আয়রন থাকে। হেমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাংসপেশীতে পৌঁছে দেয়, সেখানে এ অক্সিজেন মায়োগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহারের জন্য মজুত থাকে এবং গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন মত মুক্ত হয়। জারণ বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এরূপ কয়েকটি এনজাইমেও আয়রন থাকে। কলিজা, মাংস, ডিম, ফল, লাল আবরণযুক্ত চাল, গম ইত্যাদি এবং সবুজ সব্জি থেকে আমরা আয়রন পেয়ে থাকি।

কোবাল্ট ঃ ভিটামিন $B_{12}$ এর মধ্যে কোবাল্ট থাকে। এটি একটি কো-এনজাইম যা অন্য একটি এনজাইমের কাজকে সহায়তা করে। রক্তের হেমোগ্লোবিন সৃষ্টিতে এর ভূমিকা রয়েছে। মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম, দুধ, পনির ইত্যাদি কোবাল্টের প্রধান উৎস।

জিঙ্ক ঃ অনেকগুলো মেটালোএনজাইমে জিঙ্ক উপস্থিত থাকে। সুস্থ শরীরের জন্য এদের দুটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেস এবং কার্বোক্সিপেপটিডেস। প্রথমটি রক্তের লোহিত কণায় উপস্থিত থেকে আর্দ্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে $HCO_3^-$ আয়ন এবং $CO_2$ এর মধ্যে দ্রুত সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে ঃ

$$CO_2 + OH^- \xrightleftharpoons{\text{কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেস}} HCO_3^-$$

দ্বিতীয়টি পাকস্থলীর নিকটবর্তী পরিপাকরস নিঃসরণকারী অগ্নাশয়ে (pancreas) উপস্থিত থেকে পেপটাইড শিকলের কার্বোক্সিল প্রান্তে যুক্ত পেপটাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এ বিক্রিয়াতেই প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হজম হয়ে অ্যামাইনো এসিড গঠিত হয়।

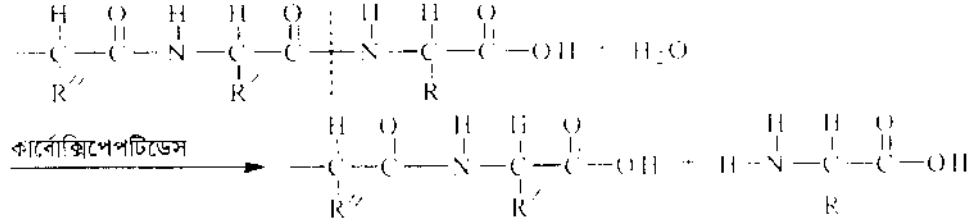


শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং প্রজনন ক্ষমতার জন্য জিঙ্কের প্রয়োজন। জিঙ্কের অভাব হলে ক্ষুধাহীনতা, শরীরের বামনাকৃতি, শরীরের কোন অংশে ক্ষত সৃষ্টি হলে তার অতি ধীর নিরাময় এবং খাদ্যবস্তুর প্রকৃত স্বাদ অনুভূতির অক্ষমতা সৃষ্টি হয়। চাল, গম, ভুট্টা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ইত্যাদিতে জিঙ্ক উপস্থিত থাকে

ম্যাংগানিজ ঃ আমাদের হাড়, বিভিন্ন কোষকলা এবং অঙ্গে ম্যাংগানিজ থাকে। আবার অনেকগুলো মেটালোএনজাইমেও এটি রয়েছে। বাদাম এবং লাল আবরণযুক্ত চাল, গম ইত্যাদি থেকে আমরা ম্যাংগানিজ পাই।

মলিবডিনাম ঃ জ্যানথাইন অক্সিডেস (xanthine oxidase) নামের একটি মেটালোএনজাইমের এটি একটি উপাদান। ইউরিক এসিড তৈরিতে এর ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ খাদ্যবস্তু থেকেই আমরা যথেষ্ট মলিবডিনাম পেয়ে থাকি।

কপার ঃ আমাদের ব্রেইন (brain), লিভার (liver), হার্ট (heart) এবং কিডনি (kidney)-তে কপার থাকে হেমোগ্লোবিন প্রস্তুতের জন্য এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বাদাম, সিম এবং মটর জাতীয় খাদ্যে কপার থাকে। কপারের অভাবে রক্তাল্পতা এবং কঙ্কালের ত্রুটি সৃষ্টি হয়।

ক্রোমিয়াম ঃ রক্তে গ্লুকোজের সহনীয় পরিমাণ ক্রোমিয়াম দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইনসুলিন সৃষ্টিতে ক্রোমিয়ামযুক্ত এনজাইম অংশগ্রহণ করে, এর ঘাটতি হলে ডায়াবেটিস রোগ হয়। মাংস এবং চাল, গম ও ভুট্টার বাইরের আবরণে ক্রোমিয়াম থাকে।

নিকেল ঃ ইউরেস (urease) এনজাইমে নিকেল থাকে। মূত্র গঠনের জন্য এটি প্রয়োজন। আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য থেকে এটি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

যে সব ধাতু শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক তাদের ঘনমাত্রাও সঠিক হতে হবে। কিছু সংখ্যক প্রোটিন এবং হরমোন এদের ঘনমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সঠিক ঘনমাত্রা থেকে কম বা বেশি পরিমাণে অত্যাবশ্যক ধাতুগুলো উপস্থিত থাকলে তারাও শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়। অনেকগুলো এনজাইমকে সক্রিয় রাখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ধাতুর অতি অল্প পরিমাণ উপস্থিতি আবশ্যক। বেশি পরিমাণে উপস্থিত থাকলে এরাও বিষ হয়। আবার কম পরিমাণে উপস্থিত থাকলে এনজাইমগুলোর সক্রিয়তা কমে যায়, এটাও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অত্যাবশ্যক কোন ধাতু শরীরে কম পরিমাণে উপস্থিত থাকলে সঠিক খাদ্য অথবা ঔষধ গ্রহণ করে সে ঘাটতি পূরণ করা যায়। যেমন, আয়রনের ঘাটতি হলে রক্তে হেমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়, আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে এ ঘাটতি পূরণ করে রক্তে হেমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ ফিরে পাওয়া যায়

মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলের বান্টু (Babntu) বলে পরিচিত জনগোষ্ঠি লোহার পাত্রে এক রকম হালকা মদ প্রস্তুত করে। এ মদ পান করে তাদের শরীরে প্রয়োজন থেকে বেশি আয়রন জমা হয়, ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আমাদের শরীরের কোষসমূহ একটি হালকা আবরণে ঢাকা থাকে যার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু আয়ন (যেমন $Na^+$ এবং $K^+$ আয়ন) আসা যাওয়া করতে পারে। এ কোষ আবরণের বাইরের তরলে $Na^+$ আয়নের ঘনমাত্রা বেশি থাকে এবং অভ্যন্তরস্থ তরলে $K^+$ আয়নের ঘনমাত্রা বেশি থাকে। সুস্থ শরীরের জন্য কোষ তরলে দুটি আয়নের এরূপ উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। কলেরা এবং ডাইরিয়া আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে বার বার পাতলা পায়খানার সাথে প্রচুর পানি এবং লবণ বের হয়ে যায়, ফলে রোগী ক্রমশ দূর্বল হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। এ ধরনের রোগীকে সুস্থ করার জন্য তাকে প্রচুর পরিমাণে সঠিক ঘনমাত্রার লবণ-পানির সরবত খাওয়ানো হয় অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি এরূপ দ্রবণ তার রক্তে মিশিয়ে দেয়া হয়। এভাবে অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করা হয়। উল্লেখ্য, রক্তে লবণের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রা থেকে বেশি হলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

শরীরে অত্যাবশ্যক ধাতুগুলোর পরিমাণ বেড়ে গেলে তা কোষকলায় (tissues) জমা হয়ে কোষকলা ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং এ পরিমাণ সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করলে বিষক্রিয়ার শৃঙ্খলিত বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ধাতুদূষণের কারণে শরীরের লবণ সাম্যতা (electrolytic balance) বিঘ্নিত হয়, জীবনের জন্য অপরিহার্য্য এনজাইম/মেটালোএনজাইমগুলোর স্বাভাবিক সক্রিয়তা বিঘ্নিত হয় এবং কতিপয় বিশিষ্ট দেহযন্ত্র, যেমন-মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি, লিভার ইত্যাদির ক্ষতি হয়। এর ফলে শরীর অসুস্থ হয়, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

কপার শরীরের সুস্থতার জন্য একটি অত্যাবশ্যক অত্যাল্প মৌল (essential trace element)। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের শরীরে ০.১০–০.১৫ গ্রাম কপার প্রয়োজন। বিভিন্ন মেটালোএনজাইম এবং মেটালোপ্রোটিনে সামান্য পরিমাণ কপারের উপস্থিতি আবশ্যক। হেমোগ্লোবিন তৈরিতে এর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে সামান্য বেশি কপার লবণও যদি শরীরে প্রবেশ করে তাহলে তার বিষক্রিয়া শুরু হয়। প্রোটিন এনজাইমে অবস্থিত -SH গ্রুপের সাথে অতিরিক্ত কপার যুক্ত হয়ে এনজাইমের স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। ফলে বমিবমি ভাব এবং পাকস্থলির প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

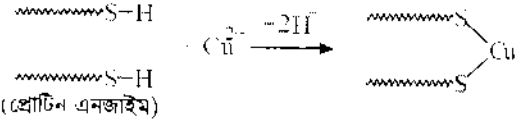

(প্রোটিন এনজাইম)

উইলসন্স রোগ (Wilson's disease) বলে পরিচিত আক্রান্ত রোগীর দেহে কপার নিয়ন্ত্রণ কৌশল নষ্ট হয়ে যায়। শরীরে যত কপার প্রবেশ করে তার সাথে বেড়িয়ে যাওয়া কপারের পরিমাণের কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

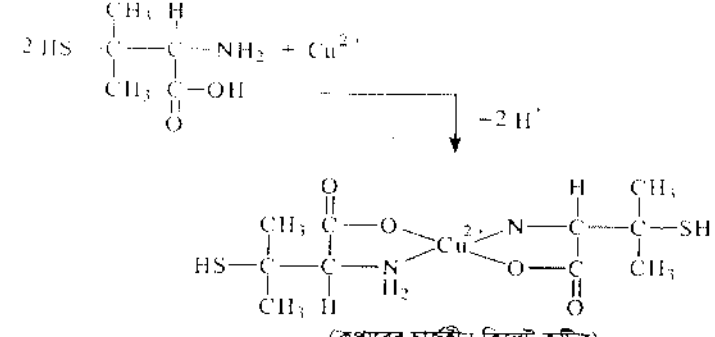

(কপারের চার্জহীন কিলেট জটিল)

ফলে লিভার, কিডনি এবং ব্রেইনে বাড়তি কপার জমা হয় যা স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম নষ্ট করে দেয়। এরফলে মানসিক ভারসাম্য এবং লিভার ও কিডনির স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, যার শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। যদি অতিরিক্ত কপার শরীর থেকে বের করে নেয়া যায় তাহলে সুস্থতা ফিরে আসে। রোগীকে পরিমিত পরিমাণ পেনিসিলামিন (I) খাইয়ে এ চিকিৎসা করা হয়। এটি একটি কিলেট গঠনকারী লিগ্যান্ড যা কপারের সাথে একটি চার্জমুক্ত অতি সুস্থিত কিলেট জটিল গঠন করে শরীর থেকে অতিরিক্তি কপারকে বের করে দেয়।

আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, মারকারি, লেড, বেরিলিয়াম, অ্যান্টিমনি, থ্যালিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু শরীরের জন্য আদৌ কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে না। এসব ধাতু এবং তাদের যে কোন যৌগ শরীরে প্রবেশ করলে তারা বিষ হিসেবে কাজ করে। এরা প্রোটিন এবং প্রোটিন এনজাইমে উপস্থিত থায়ল গ্রুপের (-SH) সাথে যুক্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক আচরণে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে শরীর অসুস্থ হয়। বিষাক্ত ধাতুগুলো শরীর থেকে মুক্ত করার জন্য কিলেট জটিল গঠনকারী কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করা হয় যা নিজে বিষাক্ত নয়, কিন্তু বিষাক্ত ধাতুর সাথে অতি সুস্থিত কিলেট জটিল গঠন করে তাদেরকে শরীর থেকে মল-মূত্রের সাথে বের করে দেয়। অতিরিক্ত কপার বের করার একটি পদ্ধতিতে পেনিসিলামিনের (I) ব্যবহার ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য ধাতুগুলোর জন্যও এটি ব্যবহার করা যায়। এরূপ আরো কয়েকটি লিগ্যান্ডকে ঔষধ হিসেবে বিভিন্ন ধাতুর জন্য ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ (II - V)।

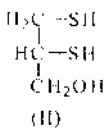

(II)

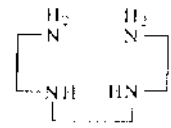

(III)

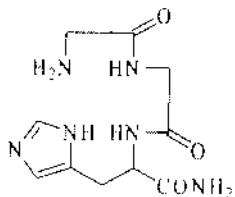

(IV)

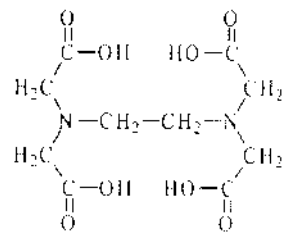

(V)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্সেনিক যৌগ লুইসাইট, $ClCH{=}CH\text{-}AsCl_2$), কে একটি অতি বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এ গ্যাসকে শরীর থেকে বের করার জন্য ঔষধ (II) ব্যবহার করা হয় যা আর্সেনিকের সাথে একটি সুস্থিত কিলেট জটিল গঠন করে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

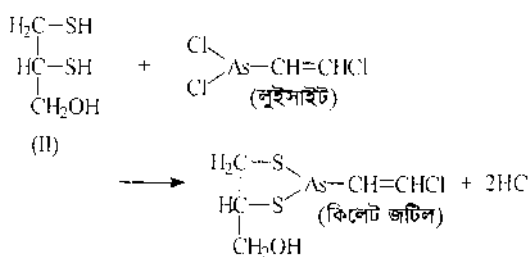


মারকারি, কপার, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি বিষাক্ত ধাতুর ক্ষেত্রেও এই ঔষধটি ব্যবহার করা যায়। ঔষধ (V), যা EDTA নামে পরিচিত, একটি ষড়দন্তী লিগ্যান্ড এবং সব ধাতুর সাথেই এটি অতি সুস্থিত ১:১ জটিল গঠন করে।

অতি বিষাক্ত লেড ধাতুর বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় এর $Na_2CaEDTA$ লবণের দ্রবণ ইনজেকশন করে শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। $Na_2PbEDTA$ গঠন করে বিষাক্ত লেড প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে নির্গত হয়। লেডের কারণে সৃষ্ট চর্ম রোগের চিকিৎসা $Na_2CaEDTA$ ক্রিম ব্যবহার করা হয়।

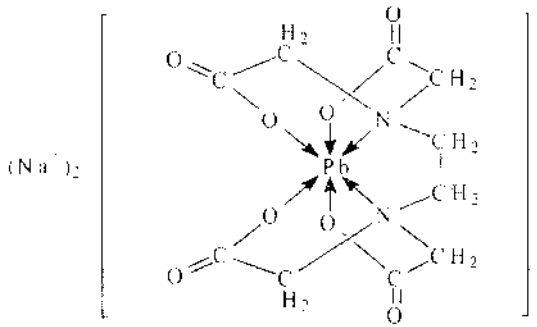

($Na_2PbEDTA$ জটিল)

আমাদের দেশে এখনও রান্নার বাসন হিসেবে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করা হয়, যা উন্নত দেশসমূহে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করলে অথবা উত্তপ্ত খাদ্যবস্তু রাখা হলে কিছু পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম খাবারের সাথে শরীরে প্রবেশ করে যা ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়ে আমাদের চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধির হ্রাস ঘটায়। এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে সকলেরই রান্না ঘর থেকে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র পরিহার করা উচিত।

যে ধাতুগুলো মানব দেহে মারাত্মক বিষ হিসেবে কাজ করে পারদ তাদের প্রথম কয়েকটির মধ্যে একটি। থার্মোমিটার ভেঙ্গে গেলে চকচকে যে তরল মেঝেতে গড়াগড়ি করে তা হলো পারদ। এ থেকে আমাদের সবারই সাবধান হওয়া উচিত। এ তরল কখনো ছোঁয়া যাবে না, কৌশলে কাগজে তুলে বাড়ির বাইরে মাটির নিচে ফেলে দিতে হবে, যদি গন্ধক (সালফার) থাকে তাহলে কিছুটা গন্ধক মিশিয়ে দেবেন। দেখতে ভাল হলেই সব কিছু ভাল হয় না।

একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে ধাতু দূষণ সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করব। আমি রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপনা করি। অনেক দিন আগের এক সকালে আমি আমার অফিস কক্ষে একজন বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম। তিনি পরিসংখ্যানের অধ্যাপক। লক্ষ্য করলাম, আমার একজন ল্যাবরেটরী সহকারী একটি কাঁচের বোতলে অনেকটা পারদ (mercury) এনে তাঁর হাতে দিলেন; খুশি হয়ে তিনি ল্যাবরেটরী সহকারীকে ধন্যবাদ জানালেন। আমি তাঁকে পারদ সংগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, তাঁর মাথার চুলে উকুন হয়েছে, উকুন ধ্বংশের জন্য তাঁর এক বন্ধু তাঁকে কয়েকদিন মাথায় পারদ মালিশ করার পরামর্শ দিয়েছেন, সেজন্যই তিনি পারদ সংগ্রহ করতে এসেছেন। আতঙ্কে চমকে উঠে তাঁর হাত থেকে পারদ কেড়ে নিয়ে আমি বলেছিলাম, আপনার মহাসর্বনাশ হবে। পারদ মাথায় ঘসলে আপনি কয়েক দিনের মধ্যে আস্ত পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন। মহাবিস্ময়ে ভীত হয়ে তিনি নির্বাক বসেছিলেন ক্ষণকাল। এতকাল যাকে তিনি বন্ধু ভেবেছেন তিনি তাঁর এতবড় শত্রু হলেন কি করে! ভুল, সবই ভুল।

ড. কালিপদ কুণ্ডু
প্রফেসর
রসায়ন বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

# ঈশ্বরকণা ও সত্যেন বোস

৪ জুলাই, ২০১২ পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে গত কয়েক দশকের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ৮৮ বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে রহস্য কণার সন্ধানে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছেন ৪ জুলাই সেই অধরা কণার আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়া হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত ইউরোপের প্রভাবশালী বিজ্ঞান সংস্থা–European Organization for Nuclear Research (CERN) জেনেভা ও লন্ডনে পৃথক সম্মেলনে এ আবিষ্কারের ঘোষণা দেন।

সার্ন (CERN)-এর বিজ্ঞানীদের এই নতুন কণা আবিষ্কারের ঘোষণার সাথে সাথেই দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে তো বটেই তাবৎ দুনিয়ার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নড়ে-চড়ে বসল। কণাটির নাম 'হিগস-বোসন'–যাকে 'ঈশ্বরকণা' বা 'গড পার্টিকল' নামেও ডাকা হয়। সেই অনেক দিনের অধরা কণার সন্ধান মিলেছে–এতদিন ধরে যে কণাটিকে বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন।

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক–আবিষ্কৃত এ কণা নিয়ে এত আয়োজন, এত আলোড়ন, এত মাতা-মাতি কেন? বস্তুর 'ভর' হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভর না থাকলে পরমাণু ও যেকোনো বস্তু গঠনকারী মৌলিক কণাগুলো আলোর গতিতে অবিরত ছুটে বেড়াত। তার মানে এরা কখনো জমাট বাঁধত না, যার অর্থ কোনো পদার্থ সৃষ্টি হতো না। আর তাহলে কিছুই সৃষ্টি হবার কথা নয়। অথচ সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্ব। আর বিশ্ব জুড়ে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালাসহ কতই না বস্তু! বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলেন। অবশেষে ১৯৬৪ সালে বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগসসহ আরো কিছু বিজ্ঞানী একটি তাত্ত্বিক ধারণা উপস্থাপন করেন। পিটার হিগস বললেন–সৃষ্টি জগতে আরেক ধরনের কণা না থেকেই পারেনা–যে কণা মহাবিশ্বে ভর সৃষ্টি করছে।

এ তত্ত্বে বলা হয় বিগ-ব্যাং (মহাবিস্ফোরণের)-এর পর মহাবিশ্বের শুরুতে তাপমাত্রা ছিল অনেক বেশি তখন সব কিছু ছিল শক্তি হিসেবে। কোনো কিছুর ভর ছিল না। তখন সব কিছুই ছুটত ফোটনের মত আলোর বেগে। অনেক পরে মহাবিশ্ব কিছুটা ঠাণ্ডা হবার পর সেখানে সৃষ্টি হয় অদৃশ্য এক বল যাকে বলা হয় হিগস ফিল্ড। এই ফিল্ডে তৈরি হয় অজস্র ক্ষুদে কণা–'হিগস-বোসন'। এ হিগস ফিল্ড দিয়ে ছুটে যাবার সময় সব কণা হিগস-বোসনের সংস্পর্শে এসে ভর প্রাপ্ত হয়। যে যত বেশি বাঁধা প্রাপ্ত হবে সে তত ভর প্রাপ্ত হবে

আর এর পরই সৃষ্টি হয় পদার্থ সৃষ্টির পালা। হিগস-বোসন কণা না থাকলে বস্তু জগতও আসতো না, তৈরি হতো না এ শ্যামল পৃথিবী–আমরাও আসতাম না। যে কণা জন্ম দেয় বস্তুর ভরের–সেই কণার আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক আলোড়িত ঘটনা। এত দিন যে কণাটি বিজ্ঞানীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল–তার আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের একটু উৎফুল্ল, উদ্বেলিত, আবেগাপ্লুত তো করবেই এ আর বিচিত্র কী ?

১৯৬৪ সালে যে বিজ্ঞানী এ কণাটির তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই বৃটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিগস কণাটির আবিষ্কারে খুব উল্লসিত। ৮৩ বছর বয়সী এ বিজ্ঞানী প্রচণ্ড আবেগে কেঁদে ফেলেন তিনি বলেন–'আমি কখনোই প্রত্যাশা করিনি যে–আমার জীবদ্দশাতেই এটা ঘটবে'!

বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলেন–এ কণার আবিষ্কারে অনেক তত্ত্বের অনেক প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা যাবে। হিগস-বোসন কণার অস্তিত্ব মিলেছে বলে পদার্থবিদ্যার একটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি বলেন–বিষয়টি খুবই জটিল, মহাবিশ্বের শুরুতে সবকিছু ছিল শক্তি হিসেবে। কোনো কিছুর ভর ছিল না। অনেক পরে মহাবিশ্ব কিছুটা ঠাণ্ডা হবার পর কণিকাগুলো এক সময় ভর লাভ করে। এটিই হিগসের তত্ত্বের মূল কথা।

কেন কণাটির এরকম নাম হলো ? তাবৎ দুনিয়ার সব মৌলিক কণাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে তার একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য বাঙালি অধ্যাপক সত্যেন বোসের নামে বোস কণা বা 'বোসন' আর অন্যটি

ইতালিয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামে ফার্মি কণা বা 'ফার্মিওন'।

সব মৌলিক কণারই একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে ঘূর্ণন (spin) যা কিনা পূর্ণ সংখ্যা (0,1,2...) বা অর্ধপূর্ণ সংখ্যা (1/2, 3/2, ...) দ্বারা নির্দেশিত হয়। যে কণাগুলির স্পিন পূর্ণ সংখ্যা সে কণার দল 'বোসন'। আর যাদের মান অর্ধপূর্ণ সংখ্যা তা হল 'ফার্মিওন'।

কণাগুলোর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সহজ ভাষায় বললে–ফার্মিওন কণাগুলো যেন একটু ঝগড়াটে ধরনের, একই ধরনের কণা হলেও এক জায়গায় থাকতে পারে না–থাকতে হয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। সে তুলনায় 'বোসন' কণা শান্ত, সামাজিক, সঙ্গ প্রিয়, আড্ডাবাজ। 'বোসন' কণা যত খুশি গাদা-গাদি করে রাখা যায় এক জায়গায়, এতে কোনো সমস্যা হয় না। এমনি একটি পরিচিত বোসন কণা হল আলোর কণা–ফোটন। আর ফার্মিওন কণা হচ্ছে–ইলেকট্রন।

ফার্মিওনের জন্য এক ধরনের পরিসংখ্যান সূত্রই গড়ে ওঠেছে–সেটা ফার্মিডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স নামে পরিচিত। বোসনের পরিসংখ্যান সূত্রকে বলা হয় বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স।

সার্নে আবিষ্কৃত এ কণাটির স্পিন শূন্য (০), এটি বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স সূত্র মেনে চলে। তাই এটিও বোসন কণা ছাড়া আর কী ? এ কণাটি আবিষ্কারের ফলে শূন্য ঘূর্ণনের কোনো কণার প্রথম দেখা মিলল। বস্তুর ভর দানকারী এ 'বোসন' কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ১৯৬৪ সালে পিটার হিগসসহ ছয় বিজ্ঞানী একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। হিগস ও তাঁর সহকর্মীরা এ গবেষণা এগিয়ে নিয়েছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স তত্ত্বের সাহায্যে। আবার যেহেতু এরকম কণার সম্ভাবনার কথা তাত্ত্বিকভাবে হিগসই প্রথম বলেছিলেন–তাই হিগস ও সত্যেন বোসের নাম যোগ হয়ে কণার নাম হয়েছে 'হিগস-বোসন' কণা। এ কণার অস্তিত্ব তখন কেবল তাত্ত্বিকভাবে কাগজে কলমে ছিল। তাত্ত্বিক এ সম্ভাবনার পর বিজ্ঞানীরা এ কণাকে ধরতে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই ধরা দেয় না কণাটি। মেলেনি কোনোভাবেই এই ভূতুড়ে কণার সন্ধান। ত্যক্ত-বিরক্ত বিজ্ঞানীরা এ অধরা কণাকে তখন 'গড ড্যাম' পার্টিকল নামে ডাকতে থাকেন। পরে গড ড্যাম নামটি আর একটু পরিবর্তিত হয়ে 'গড পার্টিকল' বা ঈশ্বর কণা হয়ে যায়–যার আসল নাম বোসন বা হিগস-বোসন কণা।

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক এ ভূতুড়ে কণার আবিষ্কার এত দেরিতে কেন ? কেনই বা এ কণার দেখা এতদিনেও মেলেনি ? সহজ কথায় উত্তর দিলে বলতে হয়–কারণ এরা অতি ক্ষণস্থায়ী। জন্ম মাত্রই অন্যকে ভর জুগিয়ে এরা নিঃশেষ হয়ে যায়। মনে হয় এরা অন্যের জন্যই তৈরি। যেমন বলা হয়–ফুল আপনার জন্য ফোটে না। এত কিছুর পরেও দেখা গেছে এ কণার ভর 125-126 Gev (গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট) বা ($1.8x10^{-27}$kg)। এর চার্জ শূন্য। শূন্য এর স্পিন। এর অর্ধায়ু (Half life) বড়জোর সেকেন্ডের দশ হাজার কোটি কোটি ভাগের এক ভাগের শামিল। আবিষ্কৃত এ কণা আসলেই হিগস-বোসন কি-না তা শতভাগ নিশ্চিত হতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত যত তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে–তাতে এটা যে হিগস-বোসন তা 99.999 ভাগ নিশ্চিত।

যে গবেষণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে হিগস-বোসন কণার সন্ধান পাওয়া গেছে সেই–লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার কী? লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার সংক্ষেপে এল.এইচ.সি. (Large Hadron Collider, L.H.C.) হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যন্ত্র –

একটি কণা ত্বরক (পার্টিকল এক্সেলেরেটর) ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে মাটির প্রায় 100 মিটার নিচে তৈরি করা হয়েছে। বৃত্তাকার এই কণা ত্বরকের পরিসীমা 27 কিলোমিটার। এ যন্ত্রের নির্মাণ ব্যয় প্রায় 50 হাজার কোটি টাকা। লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার যন্ত্রে প্রোটনের দুটি বিম থাকে। একটি ঘড়ির কাঁটার দিকে অন্যটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে। এই এল.এইচ.সি. এক্সেলেরেটরে প্রোটনের গতিবেগ আলোর গতি বেগের প্রায় 99.999999 শতাংশ। এটি মোটামুটিভাবে অচিন্তনীয় ব্যাপার। এ যন্ত্রে প্রোটনের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকা অবস্থায়

এল.এইচ.সি.-কে প্রতি সেকেন্ডে 12 হাজার 200 শত 45 বার পরিভ্রমণ করে। যেকোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রোটনের স্রোত প্রতি সেকেন্ডে 60 কোটি সংঘর্ষ ঘটিয়ে মিনি বিগ ব্যাংয়ের অবস্থার সৃষ্টি করেন বিজ্ঞানীরা। এই সংঘর্ষে খুবই অল্প সময়ের জন্য সূর্যের চেয়েও এক লাখ গুণ বেশি তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়–যা বিগ-ব্যাং-এর অব্যহতি পরের অবস্থা। এই মিনি বিগ ব্যাংয়ে উৎপন্ন কণাগুলো বিশেষ ডিটেক্টরে নির্ণয় করে এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়।

বিজ্ঞানের যে কোনো মৌলিক অগ্রগতিই মানব-সভ্যতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক আবিষ্কারের ফলই রাতা-রাতি হাতে-নাতে পাওয়া যায় না। তারজন্য কখনও কখনও অপেক্ষা করতে হয় যুগের পর যুগ। বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে 'বিগ-ব্যাং' এর মাধ্যমে জন্ম হয় এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের। কিন্তু কোথা থেকে আকার-আয়তন, ভর পেল এ ব্রহ্মাণ্ড? কিভাবেই বা-তা স্থিতি লাভ করল? বিজ্ঞানের এমন অনেক অমিমাংসিত বিষয়ের জবাব মেলবে এ হিগস-বোসন কণা আবিষ্কারের ফলে। পৃথিবীর পুরো বিজ্ঞানী সমাজ তার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই আবিষ্কার তাই মানব সভ্যতার জন্য মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। বিজ্ঞানীরা অন্তত তাই মনে করছে।

যে বিজ্ঞানীর নামে এত অলোচিত কণার নাম হয়েছে হিগস-বোসন কণা। যে বিজ্ঞানীর তত্ত্ব সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হয়–সেই বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের অবদান সম্পর্কে আমরা তেমন ওয়াকিবহাল না। বিজ্ঞানের একটি অতি সাম্প্রতিক শাখার তিনি উদ্ভাবক। শাখাটির নাম 'কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব'। 'কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব' গড়ে ওঠেছে 'বোস সংখ্যায়ন সূত্রের' ওপর ভিত্তি করে।

মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ যাঁর সহপাঠী, জগদীশ চন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় যাঁর শিক্ষক–সেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা সত্যেন বোস এত বড় বিজ্ঞানী হবেন–তা যেন তাঁর জন্য ঠিকই হয়েছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আগুনের টুকরো এই প্রতিশ্রুতিশীল তরুণকে চিনতে ভুল করেননি। তিনি সত্যেন বোসকে ১৯১৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষকরূপে নিয়োগ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সায়েন্স কলেজে। এর পর তিনি ১৯২১ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৪০০ টাকা। তরুণ শিক্ষক সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্ব পড়াতেন–পড়াতে গিয়ে তাঁর খটকা লাগে। কিছুতেই তত্ত্বটি তিনি ঠিকভাবে মেলাতে পারছিলেন না। তাঁর কাছে মনে হলো–তত্ত্বে কোথাও কোনো অসংগতি আছে। সেই তত্ত্বটি সত্যেন বোস দেখলেন সন্দেহের চোখে। শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি সত্যেন বোস নিজের মতো করে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান। যে তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন–তার মানে পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক তোলা–তা আবার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ বছরের একজন তরুণ বাঙালি অধ্যাপকের! এটা বিস্মিত মনে হতে পারে। আসলে ঐ তত্ত্বে অসংগতিই ছিল ; অসংগতিটি কী এবং তা কী হবে তাও যের করেন সত্যেন বোস। এ নিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন–নাম 'প্লাঙ্কস ল অ্যান্ড দ্যা লাইট কোয়ান্টাম হাইপোথিসিস।' চার পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটি পাঠালেন লন্ডনে–ফিলোসোফিক্যাল ম্যাগাজিনের দপ্তরে যারা এর আগেও তাঁর গবেষণাপত্র ছেপেছিল। এবার না ছেপে পাঠাল ফেরত। বসু এবার তা পাঠালেন আইনস্টাইনের কাছে। সাথে একটা চিঠি। চিঠিতে আইনস্টাইন-কে 'শ্রদ্ধেয় গুরু' সম্বোধন করে সত্যেন বোস লিখলেন–'পর্যবেক্ষণ আর মতামতের জন্য আপনার কাছেই এ প্রবন্ধ পাঠালাম। পড়ার পর আপনি কী মনে করেন তা জানার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছি। লেখাটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার মতো যথেষ্ট ভাষা জ্ঞান আমার নেই। যদি মনে করেন এটি ছাপার যোগ্য সে ক্ষেত্রে এটি 'সাইটশ্রিফট ফুয়ার ফিজিকে' প্রকাশের ব্যবস্থা করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

প্রবন্ধ পেয়ে আইনস্টাইন চমৎকৃত হলেন খানিকটা–কারণ বিগত বিশ বছর ধরে তিনি যে মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাই আজ না চাইতেই একেবারে হাতে! আইনস্টাইন নিজেই অনুবাদ করে গবেষণা পত্রটি ১৯২৪ সালে জুলাই মাসের প্রথম দিকে সাইটশ্রিফট ফুয়ার ফিজিক (Zeitschrift Fur physik)

জার্নালে ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন। প্রবন্ধটির সাথে আইনস্টাইন ফুটনোটে লিখেছিলেন–'বোসের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'–শুধু মাত্র অনুবাদ এবং একটি ফুটনোটের জন্য বিশ্বখ্যাত এই পরিসংখ্যান সূত্রটিতে আইনস্টাইনের নাম ঢুকে গেছে–এটাকে কেউ বোস স্ট্যাটিস্টিক্স বলে না–সবাই এটাকে বলে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর–আইনস্টাইন নিজে সেটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন এবং বের হয়ে এলো জগদ্বিখ্যাত–বসু-আইনস্টাইন ঘনীভূত অবস্থা (Bose-Einstein Condensation) সংক্ষেপে–বেক (BEC)। এটাকে বলে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা। এই 'বেক' এর ওপর কাজ করার জন্য ২০০১ সালে তিনজন পদার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সত্যেন বোস নোবেল পুরস্কার পাননি কিন্তু তাঁর কাজের ওপর গবেষণা করে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কার কেবল জীবিতরাই পেয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে হয়ত সত্যেন বোস কখনও সেটা পাবেন না। তবে এখন মানুষ জানে–নোবেল পুরস্কার দিতে পারলে নোবেল কমিটিই ধন্য হতে পারতো।

সত্যেন বোস–সুদীর্ঘ ২৪ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু কী আশ্চার্য গৌরবময় ২৪টি বছর! অসাধারণ এ বিজ্ঞানী দেশ বিভাগের ঠিক আগ মুহূর্তে কলকাতা ফিরে যান। তাঁর কর্মময় জীবনে একটা অংশ তিনি শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেছেন। সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে উচ্চতর গবেষণার একপর্যায়ে প্যারিসে কুরি গবেষণাগারে কাজ করেছেন। পরে তিনি কাজ করেছেন বিজ্ঞানী মেরি কুরির সাথে রেডিয়াম ইন্সটিটিউটেও। ১৮৯৪ সালে ১লা জানুয়ারি উত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন সত্যেন বোস–১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে ৮০ বছর বয়সে কর্মময় এই মানুষটির জীবনাবসান হয়।

*তথ্যসূত্র ঃ*

১। বিজ্ঞান সমগ্র–এ.এম. হারুন অর রশীদ।
২ সত্যেন্দ্রনাথ বসু–সম্পাদনা, তপন চক্রবর্তী।
৩। আরো একটুখানি বিজ্ঞান–মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
৪। বিবিসি।
৫। বিজ্ঞান কোষ।
৬। প্রথম আলো।
৭। আমার দেশ।
৮। কালের কণ্ঠ।

**জহুরুল হক বুলবুল**
বিভাগীয় প্রধান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কালিহাতী কলেজ, টাঙ্গাইল

# পৃথিবী, সূর্য ও তারাদের রহস্য

রহস্য–১ ঃ

সৃষ্টিলগ্ন থেকে অবিরত ঘুরছে পৃথিবী। অথচ আমরা এতটুকুনও টের পাচ্ছিনা। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের অনন্ত অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ এই রহস্যের জট খুললেও রহস্য উন্মোচিত হয়নি পুরোপুরি। পৃথিবী নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত পাক খাচ্ছে লাট্টুর মতো। একে বলা হয় আহ্নিকগতি। পৃথিবীর নিরক্ষরেখা ভারতের মত অন্য যে সকল অঞ্চলের ওপর দিয়ে গেছে সেখানে পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ প্রতি সেকেন্ডে ০.৪৬৪ কি.মি এর মতো। তবে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে এই বেগ ক্রমশ কমতে থাকে। এর পর আসে পৃথিবীর বার্ষিক গতি। এক নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরার বেগ সেকেন্ড ৩০ কি.মি। প্রচন্ড বেগে পৃথিবীর এ দু'রকমের ঘোরাকে আমরা যে মোটেও টের পাই না তার কারণ, মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীর সাথে সাথে আমরাও ঘুরছি ঐ একই বেগে। শুধু তাই হয়–আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমান বেগে ঘুরছে আমাদের চারপাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, বাতাস, মেঘ–সবই। আমাদের চারপাশের পরিবেশের তুলনায় আমরা স্থির বলেই নিজেদের এবং পৃথিবীর ঘোরার ব্যাপারটা আমরা টের পাই না। রেলগাড়ি চেপে যাওয়ার সময় বাইরের দিকে তাকালে বাইরের গাছপালা, বাড়ি-ঘরের উল্টামুখে ছুটে যাওয়া দেখে আমরা গাড়ির বেগ আন্দাজ করতে পারি। ট্রেনের কামরায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে না তাকালে বোঝাই যায় না যে ট্রেনটা চলছে। পৃথিবী ঘোরার বেগটা যে আমরা জানতে পারি না–সেটা এই কারণেই।

রহস্য–২ ঃ

সূর্য যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তন–এর মধ্যে হাইড্রোজেন ($H_2$) এবং হিলিয়ামের ($IL_e$) এর মজুত পরিমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন সূর্য একইভাবে গত ৫০০ কোটি বছর ধরে শক্তি বিকিরণ করে চলছে। সূর্যের ভিতরে এখনও যে পরিমাণ রসদ মজুদ রয়েছে তাতে অন্তত আরও হাজার কোটি বছর ধরে সে আলো ও তাপের জোগান দিয়ে যাবে। কিভাবে সম্ভব হচ্ছে/হবে ???!!!..... সূর্য হল জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড। প্রাকৃতিক তাপকেন্দ্রিক পরমাণু চুল্লি। এর বাইরের তুলনায় ভিতরের তাপমাত্রা অনেক অনেক বেশি। আমরা খালি চোখে দেখি সূর্যের ভিভরের অংশ–অস্বচ্ছ এবং খুবই উজ্জ্বল–যার গড় ঘণত্ব পৃথিবীর গড় ঘণত্বের তুলনায় এক চতুর্থাংশ!!। সূর্যের ভিতরে প্রতি সেকেন্ডে বিপুল পরিমাণ $H_e$ পরিমাণ যখন জোড়া লেগে একটি $H_e$ পরমাণু গঠন করে তখন বিপুল পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হয়। সূর্যের ভিতরে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬৫.৭ কোটি টন হাইড্রোজেন নিউক্লীয় সংযোজনে ৬৫.২৫ কোটি টন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের সময় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪৫ লক্ষ টন বস্তু কণা অবলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই শক্তিই হল সূর্যের তড়িৎ চুম্বকী বিকিরণের উৎস সূর্যের বিপুল পরিমাণ বিকিরিত শক্তির মাত্র ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ–এই পৃথিবীতে এসে পৌছায়....অবিশ্বাস্য তাই না ???!!! ..... কিন্তু এটাই বাস্তব।

রহস্য–৩ ঃ

মেঘহীন রাতের অন্ধকারে অনেক সময় আকাশ থেকে আলোর ছটা নেমে আসতে দেখা যায়। একে বলা হয় 'তারা খসা'। আসলে এটা উল্কাপাত। উল্কাদের নিজস্ব কোন আলো থাকে না। এগুলো হল–একধরনের বস্তুপিন্ড যা মহাকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কোন কোন উল্কা হঠাৎ করে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ে। পৃথিবীর জোরালো মাধ্যাকর্ষণ টানের মধ্যে এসে পড়লে আর নিস্তার থাকে না। প্রচন্ড বেগে ঘন্টায় প্রায় (৮০ কি.মি.) তখন উল্কাগুলো নেমে আসে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীকে ঘিরে থাকা যে বায়ুমন্ডল রয়েছে। তার মধ্যে ঢুকে পড়ার ফলে বাতাসের কণার সাথে ঘর্ষণ শুরু হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের মত কাছাকাছি উল্কা নেমে আসে তত অধিকতর ঘন স্তরের সাথে সংঘাত শুরু হয়। যার ফলে ঘর্ষণজনিত তাপও বাড়তে থাকে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যখন উল্কাগুলো

১৬০ থেকে ৮০ কি.মি. এর মধ্যে এসে পড়ে, তখন ঐ ঘর্ষণজনিত প্রচন্ড উত্তাপে জ্বলতে আরম্ভ করে। আর তাই রাতের অন্ধকার আকাশে দেখা যায়। ঐ জ্বলন্ত আগুনের ফুলকিগুলোকে তখন তারা (Star) বলে ভুল হয়। ওগলোই জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড। অধিকাংশ উল্কাপিন্ডই মাটিতে পৌছানোর আগেই বাতাসে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। উল্কাপিন্ডের অবশিষ্ট অংশ কখনো কখনো মাটিতে এসে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ও তাপ দুটোই কমে যায়। তখন তা সাধারণ পাথরের মত দেখায়।

আফিয়া জাহান রশ্‌নী
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (২য় বর্ষ)
চট্টগ্রাম

# চেনা উদ্ভিদের অজানা গুণ

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই উদ্ভিদজগত নানাভাবে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করে আসছে। বর্তমানে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা। এগুলোর জন্য আদিকাল থেকে মানুষ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মানব জীবনের প্রতিটি ধাপে 'From Cardle to coffin' উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজগত দ্রব্যাদি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে রাজগৃহ নিবাসী বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক জীবক সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। জীবকের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ হলে গুরু তাঁকে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে এমন একটি গাছ সংগ্রহ করতে বললেন যা মানুষের উপকারে লাগে না। সারাদিন চেষ্টা করে ক্লান্ত দেহমনে তিনি গুরুর কাছে এসে জানালেন মানুষের কাজে লাগে না এমন কোন বৃক্ষ বা তরুলতা পাওয়া গেল না। দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা এদের চিনিনা, এদের সম্বন্ধে জানিনা। গ্রাম-বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'চিনলে বড়ি না চিনলে মা বোনদের জ্বাল দেয়ার ঘড়ি'। আমাদের গাছগুলোকে চিনতে হবে। জানতে হবে এইসব উদ্ভিদের ভেষজ গুণ! তবেই আমরা রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

জীবদেহের নানা ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন প্রকারের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন কারণে এসব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে জীবদেহের জৈবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটে। এই অসুস্থ অবস্থা থেকে পরিত্রান পেতে নানা রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার হয় এবং এটিই বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এসব রাসায়নিক যৌগের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু ভেষজ উদ্ভিদের তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বরং অনেকগুলোই খুব সহজে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

যে সমস্ত উদ্ভিদে মানুষের রোগ-বালাই সারিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে তাকে ভেষজ উদ্ভিদ বলে। এর গুণাগুণ নির্ভর করে সেই উদ্ভিদস্থ অ্যালকোলয়েড বা উপক্ষারের উপর। উপক্ষার হল ভেষজ উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা মানুষের রোগ দমন করে।

বিভিন্ন লেখক এবং চিকিৎসক বিভিন্ন বই ও ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। আমি জীববিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ায় এইচ.এস.সি-র উদ্ভিদ বিজ্ঞান বই এর ভেষজ উদ্ভিদ অংশটুকু নিয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর সেই আগ্রহ থেকেই বিভিন্ন বই থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কিছু উদ্ভিদ নিজের অসুশ্থতায় প্রয়োগ করেছি এবং এর ফলাফলসহ উদ্ভিদগুলো সকলের নিকট পরিচিভ করার জন্য ছবিসহ বর্ণনা করছি।

**থানকুনি ঃ** আঞ্চলিক নাম-টেয়া, মানকি, তিতুরা, থানকুনি, টেপাগর, থুলকুড়ি ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক নাম ঃ Centella asiatica।

বাসস্থান ঃ বাংলাদেশের ভেঁজা, স্যাতসেঁতে, ছায়াময় স্থানে থানকুনি জন্মে। সাধারণত পুকুর পাড়ে, ডাবগাছের গোড়াতে, পরিত্যক্ত জমি এবং ধান ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

গঠন ঃ এটি একটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। লম্বা আকৃতির লতা ভূমির উপর বেয়ে বেড়ায় এবং লম্বা বৃন্তের উপর গোলাকার খাঁজকাটা বিনারা যুক্ত পাতা উপর দিকে মুখ করে থাকে। লতানো কাণ্ডের মধ্যে সুস্পষ্ট গিট বা পর্ব থাকে। এই পর্ব থেকে শিকড় বের হয়। বসন্তকালে থানকুনি লতায় গোলাপী বা হলুদ সবুজ রং এর মিশ্রণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল আসে। এর পাতাই হলো ওষুধের প্রধান উৎস।

ঔষধিগুণ ঃ আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রের চরক সংহিতায় এর ভেষজের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। এই ভেষজের ইথানলিক নির্যাস প্রটোজোয়া বিরোধী গুণাগুণ সম্পন্ন যা (Entamoeba histolytica) এর বিরুদ্ধে কার্যকর তাই থানকুনির প্রধান আমাশয় ও অন্যান্য পেটের রোগে। এই পাতার রস ৫/৬ চামচ একটু গরম করে অথবা পাতা থেঁতো করে কাটলেটের মত ভেজে খেলে উপকার পাওয়া যায়। আমাশয়ের জন্য প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে আমাশয় ভাল হয় কিন্তু পায়খানা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তখন আরেক ধরনের অস্বস্থি দেখা দেয় কিন্তু

আমি এ রোগে থানকুনি পাতা খেয়ে দেখেছি এটা খুব দ্রুত কাজ করেছে কোন রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

এই ভেষজটির এশিয়াটি কোনাইড নামক উপাদান ক্ষত সারাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই আঘাতের ফলে কোন স্থান থেঁতলে গেলে থানকুনি গাছ কেটে অল্প গরম করে সেখানে প্রলেপ দিলে বা শরীরের যে কোন স্থানে ক্ষত হলে থানকুনি পাতা সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে ক্ষত স্থান ধুয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

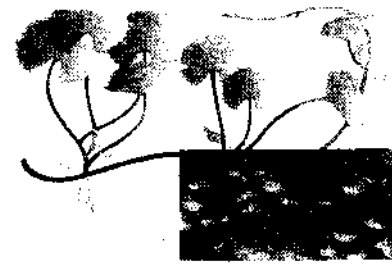

*Centella asiatica* (থানকুনি)

এই উদ্ভিদে অত্যন্ত ফলদায়ক, রুচিবর্ধক ও হজম বৃদ্ধিকারক গুণ থাকায় অনেকে এর পাতার ভর্তা, শাক এবং ঝোল রান্না করে খেয়ে থাকেন। অপুষ্টির কারণে চুল উঠে গেলে, দেহের লাবন্য ও ক্লান্তি ফিরিয়ে আনতে, স্মৃতি বিস্মরণে ২/৩ তোলা থানকুনি পাতার রসে আধাকাঁপ দুধ ও এক চামচ মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

**আকন্দ** ঃ প্রচলিত নাম-আকন্দ, অর্ক, আকন। বৈজ্ঞানিক নাম-Calotropis gigantea/procera।

আবাস ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র উঁচুভূমি ও রাস্তার পাশে বিক্ষিপ্তভাবে গাছ দেখা যায়। শুষ্ক জমিতে ভাল জন্মে, দীর্ঘসময় জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

দৈহিক গঠন ঃ এটি বহুবর্ষজীবি ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। সাদাটে সবুজ পুরু পাতার আকার বটের পাতার মত। কচি ডগার রোমশ এবং রং একই, পাতার বোঁটায় এবং ডালে দুধের মত কষ বা আঠা আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই সাদা বা হালকা বেগুনী ফুল ফুটতে দেখা যায়। বেশ বড় আকৃতির ফল হয়। ফলের নিচের দিক টিয়া পাখির ঠোঁটের মত কিছুটা বাঁকা, ভিতরে তুলা থাকে এবং তুলার ভিতর বীজ থাকে। এই উদ্ভিদের মূল, ছাল, পত্র, ফুল, কষ বা আঠা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

*Calotropis procera* (আকন্দ)

ঔষধি গুণ ঃ আকন্দ আমাদের গ্রাম-বাংলায় মূলতঃ হাঁপানি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্যই পরিচিত। ১৪টি আকন্দ ফুলের মাঝখানের চারকোনা অংশের সাথে ২১টি গোল মরিচ দিয়ে একসাথে বেটে ২১টি বড়ি করে শুকিয়ে নিয়ে প্রতিদিন সকালে একটি করে খেলে ২১ দিনে অনেকের হাঁপানি রোগের উপশম হয়। অথবা আকন্দ মূলের ছাল শুকিয়ে চূর্ণ করে আকন্দের আঠা মিশিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। পরে এটিকে বিড়ির পাতায় ঢেকে বিড়ি তৈরি করে বিড়ির মত টানলে হাঁপানির টান লাঘব হয়। পাতা সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে দূষিত ঘা কয়েকবার ধুয়ে দিলে ভাল হয়ে যায়। খোঁস, পাঁচড়া, একজিমা, দাদ রোগ ও বিছার কামড়ে আকন্দের আঠায় একটু কাঁচা হলুদ মিশিয়ে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। এই ভেষজের chemical conposition এর মধ্যে আছে Akundarin, Colotropin, Calotoxin uscharin, Calactin, calcium oxalate ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্নরকম এসিড এবং এলকোহল। মেছতার দাগে আকন্দের কস এবং সমপরিমাণ খাঁটি মধু মিশিয়ে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। এই মিশ্রণটি নিয়ে আমি পরীক্ষা চালাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যে দাগ অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে। আকন্দের পাতা গরম করে বাত আক্রান্ত স্থানে সেক দেওয়া হলে ব্যাথা কমে।

**দূর্বা** ঃ আঞ্চলিক নাম-দূর্বা, দূবলা ঘাস। বৈজ্ঞানিক নাম-Cynodon doctylon।

আবাস ঃ বাংলাদেশের গ্রামে ময়দানে সবমাটিতে দূর্বাঘাস দেখা যায়। সাধারণত পতিত মাটিতে ভাল জন্মে। ধান যেমন মানব জীবন রক্ষায় প্রধান উপাদান তেমন দূর্বা জন্মভূমিকে আঁকড়ে রেখে তার ক্ষয়রোধ করে এবং আদিভৌতিক বিপদ থেকে রক্ষা করে। আর সেই কারণে বৈদিক লৌকিক এবং মাঙ্গলিক কার্যে ধানের সাথে

দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।

দৈহিক গঠন ঃ এটা একটা বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। কান্ড মাটির সাথে শায়িত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি পর্বসন্ধি থেকে সূচালো পাতা জন্মে। যে সকল পর্বসন্ধি থেকে শাখা প্রশাখা জন্মে সেখান থেকে গুচ্ছমূল সৃষ্টি হয়ে উদ্ভিদকে মাটির সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে রাখে।

*Cynodon dactylon* (দূর্বা)

ঔষধিগুণ ঃ দূর্বাঘাসের Chemical composition এ (a) ২৪টি terpenes and its methylethers, (b) Sterols, (c) Fattyoil রয়েছে আর এর প্রভাবে দূর্বারস আশ্চর্য ভেষজগুণ সম্পূর্ণ। দূর্বার ঔষুধিগুণ সম্পর্কে ভারতীয় আয়ুর্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে–'যে কোন পিত্তবিকারের ক্ষেত্রে দূর্বা আশ্চর্য শক্তি দেখায়। কাঁটা ছেঁড়ায় দূর্বা থেতো করে চেপে বেঁধে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়। আমাশয়ে ২টি জামপাতা, ৫/৭ গ্রাম দূর্বাঘাস একসঙ্গে বেটে সেই রস ছেঁকে একটু গরম করে অল্প দুধে মিশিয় খেলে দুই দিনেই সেরে যায়। দূর্বা শুকিয়ে গুড়া করে সেই গুড়া দিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া সেরে যায়। দূর্বা ঘাস কেটে সমপরিমাণ দুধ মিশিয়ে মুখে মাখলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

**তুলসী ঃ** আঞ্চলিক নাম-তুলসী। বৈজ্ঞানিক নাম-Ocimum Sanctum।

আবাস ঃ বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে তুলসী গাছ জন্মাতে দেখা যায়; বিশেষ করে প্রতিটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ীতে এটি পাওয়া যায়।

দৈহিক গঠন ঃ তুলসী ঘন শাখা-প্রশাখাসহ ২/৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সুগন্ধযুক্ত চিরহরিৎ গুল্ম। পাতা সরল, ছোট রোমযুক্ত, কিনারা সাধারণত খাঁজকাটা, শাখা প্রশাখার অগ্রভাগ হতে পাঁচটি পুষ্পদণ্ড বের হয়। প্রতিটি পুষ্পদন্ডের চারিদিকে ছাতার মত আকৃতিবিশিষ্ট ১০-১২ টি স্তরে ফুল থাকে। ওষুধ হিসাবে পাতা মূল এবং বীজ ব্যবহৃত হয়।

ঔষুধিগুণ ঃ তুলসী গাছের স্পর্শযুক্ত হাওয়া সংক্রামক ব্যাধিকে দূরে রাখে। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারণা প্রচলিত; অনেক শিশু আছে প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভোগে। তাদের প্রতিদিন সকালে ৫-১০ ফোঁটা তুলসী পাতার রসের সাথে ৩-৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে উপশম হয়। এটি আমার দুটো বাচ্চার সর্দি-কাশি এবং জ্বরে ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পেয়েছি। হাম বা বসন্তের কালোদাগে তুলসী পাতার রস ব্যবহার করলে শরীরের কাল দাগ চলে যায়। আবার হাম বা বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার পর পিড়কা ঠিকমত বের না হলে এই পাতার রস খেলে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে যায়। পাতার রসে লবণ মিশিয়ে যে কোন চর্মরোগ ও দাদে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। পাতা ও মূলের ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে বেশ হিতকর। কোন কোন স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রিভেন্টিভ হিসাবে প্রত্যেহ সকালে গোল মরিচের সাথে তুলসী পাতার রস খেতে দেয়া হয়। এটা হজম কারক, অজীর্ণজনিত পেট ব্যাথায়, আমাশয় ও রক্তস্পর্শে ভাল ফল দেয়। বাতের ব্যাথায় তুলসী পাতার রসে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আক্রান্ত স্থানে পট্টি দিলে আরোগ্য লাভ করা যায়। সর্বোপরি কফের প্রাধান্যে যেসব রোগের সৃষ্টি, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলসী পাতা কার্যকরী। কথিত আছে বাড়ীতে অধিক পরিমাণে তুলসী গাছ থাকলে মশার উপদ্রব কমে যায়; আর এতগুণের কারণেই প্রতিটি হিন্দুবাড়ীতে এর অবস্থান এবং পূজা করা হয়।

*Ocimum sanctum* (তুলসী)

**সর্বগন্ধা ঃ** আঞ্চলিক নাম-নাকুলি, সর্পাদনী, সর্পাক্ষী, ছোট চন্দন। বৈজ্ঞানিক নাম-Rauwolfia Serpentina। আবাস ঃ বাংলাদেশের অনেক স্থানে ঝোপ জঙ্গলে এই উদ্ভিদ জন্মে তবে দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশী দেখা যায়।

দৈহিক গঠন ঃ সর্পগন্ধা একটি চিরহরিৎ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এটি ১৫-৪৫ সে.মি. পর্যন্ত উচুঁ হয়। বেশি শাখা প্রশাখা হয় না। পাতাগুলো কান্ডের চারিদিকে গজায়। পুষ্পদন্ডে গুচ্ছাকারে গোলাপী ফুল হয়, তবে বৃতি টকটকে লাল। জোড়ায় জোড়ায় ধরা ফলগুলো সবুজ থেকে পেকে বেগুনী এবং কালো বর্ণ ধারণ করে। এর মূল দেখতে মোটা তবে ভঙ্গুর এবং রং ধূসর এবং পীত বর্ণের। কাঁচা মূলের গন্ধ কাঁচা তেতুলের মত। উদ্ভিদটির নামগুলো বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন–সর্পগন্ধা অর্থ আপাত দৃষ্টিতে সাপের বিষের গন্ধ বোঝালেও আসলে সর্পাদনী অর্থ যে ভেষজ সাপের বিষ নষ্ট করে অর্থাৎ সাপের বিষ ভক্ষণ করে। সর্পাক্ষী অর্থ যার বীজ সাপের চোখের মত। এ থেকে ধারণা হয় যে, এর সাথে সাপের কোন যোগ-বিয়োগ না থেকে পারে না। এই উদ্ভিদটির মূল ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

*Rauwolfia serpentina*
(সর্পগন্ধা)

ঔষুধিগুণ ঃ উচ্চ রক্তচারপ নিয়ন্ত্রণের জন্য এর ব্যবহার অতি প্রাচীন। ব্লাড প্রেসারের সিস্টোলিক প্রেসার কমাতে সাহায্য করে এটি। কারণ এর ১৭ ধরনের এলকালয়েডের মধ্যে সারপেন্টাইন ও সারপালিস হৃদপিন্ডের উপর অবসাদ ক্রিয়া করে এবং রক্তবহ সুক্ষ সুক্ষ শিরাগুলোকে বিস্ফোরিত করে ফলে রক্তচাপ কমে।

এর মূল অত্যন্ত উত্তেজনা নাশক ও নিদ্রাকারক। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করলে সুনিদ্রা হয় ও উন্মত্ততা হ্রাস পায়। তাই উম্মাদ চিকিৎসায় সর্পগন্ধার মূল ব্যবহৃত হয়। বিহারের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের নিকট এর সম্মোহনী ও শান্তিদায়ক ক্রিয়ার কথা সুপরিচিত এবং শিশুদের ঘুম পাড়াতে এই ওষুধের ব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে।

এছাড়া মুর্ছা যাওয়া, মৃগীরোগ, বদমেজাজসহ বিভিন্ন স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় এর মূলের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। বিষধর সাপের কামড়ে হৃদযন্ত্রে তীব্র বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে রক্তের তঞ্চন ক্রিয়া অসম্ভব বেড়ে যায় এবং এক সময় হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্পগন্ধা বায়ুচাপ দমন করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এর মূলের নির্যাস প্রসব ত্বরান্বিত করে ও তলপেটের ব্যাথা, ডায়রিয়া, আমাশয়ের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

**আমলকি ঃ** আঞ্চলিক নাম-আমলা, ধাত্রী, আমলকি। বৈজ্ঞানিক নাম-Embelica officinalis।

আবাস ঃ বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জের প্রায় সব এলাকাতেই আমলকি গাছ দেখা যায়। ঢাকা-টাঙ্গাইল এলাকার পত্র মোচনশীল জঙ্গলে বেশি দেখা যায়।

দৈহিক গঠন ঃ আমলকি মাঝারি ধরনের পত্রঝরা বৃক্ষ, ৩-৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা ও ফুল হালকা সবুজ রং এর ছোট ছোট। ফলের রং ও হালকা সবুজ বা হলুদ এবং গোলাকৃতির। সুদৃশ্য ফল হিসাবে আমলকি পরিচিত। খেতে কষস্বাদের হলেও খাওয়ার পর পানি খেলে মুখে মিষ্টি লাগে। এই উদ্ভিদের ফুল, শিকড়, বাকল এবং ফল ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

*Embelica officinalis*
(আমলকি)

ঔষধিগুণ ঃ আমলকি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি বহুল প্রচলিত ফল। এটি মূত্রবর্ধক, বায়ুনাশক ও বিরোচক হিসেবে কাজ করে। বাচ্চাদের ঠান্ডা-কাঁশি প্রতিরোধে এ ফল খুব উপকারী। অনিদ্রা দেখা দিলে কাঁচা বা শুকনো আমলকি দুধে বেটে মাখনসহ মাথার তালুতে লাগালে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। পেট ফাঁপা বা অম্ল হলে ৩/৪ গ্রাম শুকনো আমলকি কাঁচের পাত্রে আগের দিন ভিজিয়ে রেখে ভাত খাওয়ার সময় ঐ পানি পান করলে উপকার পাওয়া যায়। ঐ পানি চোখ ওঠা রোগে ২/৩ ফোঁটা ব্যবহার করলে কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করা যায়। ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকি, হরিতকি ও বহেরা প্রতিটির সমপরিমাণ গুড়ার শরবত কোলেস্টেরল কমাবার মহৌষধ।

আমলকি ব্যবহারের উপকারিতা আমি নিজে লাভ করেছি। ছোট বেলায় আমার চুল এত পাতলা আর লাল

ছিল যে, অনেকে হাসি-তামাশা করত। এমনটি ক্লাশ এইটে উঠেও আমি ন্যাড়া হয়েছি। তখন আমার মা আমলা (বেনের দোকানে পাওয়া যায়, বচ, মেথিসহ বিভিন্ন জিনিস মেশানো থাকে, তবে আমলকি বেশি) আগের দিন ভিজিয়ে রেখে বেটে মাথায় দিয়ে দিত। তারপর আমার চুল ঘন, কালো এবং ৩ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়েছিল যা ছিল অনেকের জন্য বিস্ময়কর।

**আমরুল ঃ** স্থানীয় নাম-আমরুক, চুকাত্রিপত্রী, আম্বলী। বৈজ্ঞানিক নাম-Oxalis Corniculata।

আবাস ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র আমরুল দেখা যায়। এটি সাধারণত বাড়ির আশপাশে ছাড়াযুক্ত স্থানে, পুকুর দেয়ালের ধারে, পতিত চাষের জমিতে জন্মে থাকে।

দৈহিক গঠন ঃ এটি সরু লতানো ছোট ছোট উদ্ভিদ। শিকড় থেকে গুচ্ছাকারে প্রায়ই ৪টি করে ৭-১০ সে.মি. লম্বা সরু বৃন্তের মাথায় তিনটি করে হৃদপিন্ডাকার টকস্বাদের পত্রক ছাতার মত গজায়। ছোট ছোট হলুদ ফুল হয়। ফল দেখতে ঢেঁড়সের মত কিন্তু আকারে .৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাকা ফলের স্পর্শ করলে ফুট ফুট শব্দ করে সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ বের হয়ে আসে। এর কান্ড ও পাতা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

*Oxalis Corniculata* আমরুল

ঔষধিগুণ ঃ আম দোষ দূর করে বলে এটির একনাম 'আমরুল'। আমার ২/৩ বছরের বাচ্চাকে আমাশয়ের ওষুধ খাওয়াতে পারছিলাম না। আমরুল টক স্বাদের বলে সেটা খুব আগ্রহ নিয়ে খেতো। কয়েকদিন খাওয়াতে সে সুস্থ্য হয়ে উঠেছিল। এরপর থেকে ওর যখনই একটু পেট ব্যাথা হত তখন নিজেই আমরুলের পাতা খেতে বায়না ধরত। এর মধ্যে Oxalic acid থাকায় এটা ক্ষুধা বৃদ্ধি ও হজমীকারক। জ্বর চিকিৎসায়, স্কার্ভিরোগে ব্যবহৃত ওষুধের মধ্যে অন্যতম ভেষজ বলে এটা পরিচিত। আমরুলের পাতা রান্না করে খাওয়া যায়। অনেকে টক খেতে ভালভাসেন কিন্তু খেলে অম্ল হয়। এক্ষেত্রে আমরুল অম্ল পিত্ত না বাড়িয়ে রুচি বৃদ্ধি করে। মুখের দুর্গন্ধ নাশে দন্ত শোধনের জন্য আমরুল ব্যবহৃত হয়। আমরুলে Potassioum salt of oxalic acid থাকে। গায়ে চুলকানি খোষ-পাঁচড়া হলে এর রস গায়ে মাখলে উপশম হয়।

*সহায়ক গ্রন্থ ঃ*


- *উচ্চ মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান, প্রথমপত্র ঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান, লেখক-এশায়েত হোসেন, গাজী আজমল, সফিউর রহমান, তরিকুল ইসলাম*
- *ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার (প্রথম খন্ড), অবনীভূষণ ঠাকুর*
- *ভেষজের ঔষুধি গুণাগুণ (প্রথম খন্ড), ডাঃ ইবনে আখতার*



হোসনে আরা পারভীন
প্রভাষক
জীব বিজ্ঞান
ধরমপুর মহাবিদ্যালয়
দুর্গাপুর, রাজশাহী

# কত অজানারে

১. পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত উড়তে পারে সুইফট পাখি ।

২. হামিং বার্ড বা মৌটুসি পাখি সবচেয়ে ছোট পাখি । তবে এই পাখিটি একমাত্র পাখি যারা কিনা পেছনেও উড়তে পারে

৩. কালো ভালুকদের নীল রঙ এর জিহ্বা থাকে ।

৪. পাখিদের মধ্যে মেরু অঞ্চলের পেঙ্গুইনরা উড়তে পারেনা তবে সাঁতার কাটতে পারে । আর এরা বাতাসে প্রায় ৬ ফুট উঁচুতে ঝাঁপ দিতে পারে ।

৫. জিরাফদের গলার হাড় মানুষদের মতই ৭টি ।

৬. উটদের তিনটি চোখের পাতা থাকে ।

৭. স্তন্যপায়ি প্রাণীরা সাধারণত বাচ্চা প্রসব করে থাকে । প্রায় সব স্তন্যপায়ি প্রাণীই এভাবে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে । তবে অষ্ট্রেলিয়া এবং তাসমেনিয়া অঞ্চলের দুটি প্রাণী প্লাটিপাস এবং একিডনা নামক স্তন্যপায়ি প্রাণী ডিম পাড়ে । পরে সে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে

৮. মাছেরা সাধারণত ডিম দেয় । পানিতে ডিম ছাড়ে । পরে পুরুষ মাছ ডিম নিষিক্ত করে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় । কিন্তু হাঙর মাছের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম । স্ত্রী হাঙর মাছদের জরায়ুতে ডিম থাকে । পরে সে ডিম নিষিক্ত হয়ে জাইগোট এবং পরে বাচ্চাতে পরিণত হয় এবং বাচ্চাগুলো স্ত্রী মাছের জরায়ু থেকে পানিতে বের হয়ে আসে । অর্থাৎ হাঙর মাছ সরাসরি ডিম ছাড়েনা বরং বাচ্চা প্রসব করে ।

৯. সাপেরাও সাধারণত ডিম দেয় । পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় । কিন্তু পাইথন বা অজগর, ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে ।

১০. জেব্রাদের গায়ের রং আসলে সাদা । এর উপরে তাদের কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে । আর দুটি জেব্রার কখনই হুবহু একই রকমের ডোরাকাটা নক্সা থাকে না ।

১১. স্পঞ্জ, চ্যাপ্টা কৃমি, নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের কোন রক্ত পরিবহণ তন্ত্র নেই । নিডারিয়া পর্বের প্রাণীর (উদাহরণ হাইড্রা) কোন শ্বসনতন্ত্র এবং রেচনতন্ত্রও নেই । চ্যাপ্টাকৃমি যেমন-ফিতাকৃমি, যকৃত কৃমি এদের কোন রক্ত পরিবহণ তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র নেই তবে রেচনতন্ত্র রয়েছে ।

সাপ কি আসলেই জিহ্বা দিয়ে শুনতে পায় ?

অনেক মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, সাপ জিহবা দিয়ে শোনে । অনেক সাধারণ জ্ঞানের বইতেও একথা লেখা আছে যে কোন প্রাণী জিহবা দিয়ে শোনে । এর উপর সাপ । কিন্তু এটার কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নেই আসলে সাপ তার অন্তকর্ণ দিয়ে শুনতে পায় । একথা ঠিক যে সাপের মানুষ কিংবা উন্নত প্রাণীর মত বহিঃকর্ণ কিংবা মধ্যকর্ণ নেই এবং টিমপেনিক মেমব্রেন এবং মধ্যকর্ণে তিনটি অস্থি নেই মানুষের ক্ষেত্রে শব্দ বাতাসের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং তা টিমপেনিক পর্দায় আঘাত করে যা মধ্যকর্ণে অবস্থিত অস্থিসমূহের নড়াচড়া ঘটায় এবং অন্তকর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষসমূহের কম্পনের সৃষ্টি করে । এই কম্পন পরে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছায় এবং মানুষ শুনতে পায় । সাপের ক্ষেত্রে সাপের বহিঃকর্ণ গঠিত থাকে এবং তাদের

অন্তকর্ণ সরাসরি তাদের নিচের চোয়ালের হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে । সাপ যেহেতু সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী এরা মাটির খুব কাছাকাছি থাকে এবং চলাচলের সময় এদের চোয়ালের হাড় ভূমির খুবই কাছে থাকে । তাই যে কোন ধরনের শব্দ যেমন সেটা শিকার কিংবা শিকারির পায়ের শব্দ কিংবা সাপুড়ের বীণ বাজানোর শব্দ হোক মাটি থেকে সাপের চোয়ালের হাড়ের মাধ্যমে কম্পিত হয়ে অন্তকর্ণে পরিবাহিত হয় । পরবর্তিতে এই কম্পন অন্তকর্ণ হয়ে অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে বার্তা বা সংকেত পাঠায়, এর ফলে সাপ শুনতে পায় । সুতরাং সাপ জিহ্বা দিয়ে শোনে একথার কোন বিজ্ঞানসম্মত সত্যতা নেই ।

BANSDOC Library Dhaka

মোর্শেদা বেগম রিপা
ঙ-৬ (২য় তলা পূর্ব)
নূরবাগ মসজিদের উল্টোপাশ গলি
খিলগাঁও তালতলা
ঢাকা

BANSDOC Library Dhaka

BANSDOC Library Dhaka

## বিজ্ঞানের দর্শনীয় বস্তুসমৃদ্ধ দেশের একমাত্র

# জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

## পরিদর্শন করুন

### ▶ এখানে রয়েছেঃ

দেশের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীণতম কম্পিউটার, প্রাচীণ মুদ্রণ যন্ত্র, বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিমান ইঞ্জিন, বিশাল নীল তিমির কঙ্কাল, উড়ুক্কু মাছ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিস্কৃত ফসিল, মহাকাশ থেকে পতিত দুর্লভ উল্কাপিণ্ড, জাপানের আগ্নেয়গিরির লাভা, বিজ্ঞানের মজার মজার খেলা, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছবি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, সায়েন্স পার্ক, ঐতিহাসিক নীলের বাগান, লাক্ষা আর রেশমের অজানা তথ্য, বৃহৎ ও শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ দর্শনের অপূর্ব সুযোগসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আবিস্কার ও দুর্লভ প্রদর্শনীর আকর্ষণীয় সমারোহ।

### ▶ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৮টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারী রয়েছে ঃ

- পদার্থ বিজ্ঞান গ্যালারী
- শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারী
- তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারী
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারী
- জীব বিজ্ঞান গ্যালারী
- তরুণ বিজ্ঞানী গ্যালারী
- মজার বিজ্ঞান গ্যালারী ১ ও ২

BANSDOC Library Dhaka

### ▶ সর্বশেষ সংযোজন ঃ

- মিউজু বাস (ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী)
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারী
- আর্থ-কোয়েক সিম্যুলেটর

### ▶ জাদুঘর গ্যালারী পরিদর্শনের সময় ঃ

- শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫-০০ ঘটিকা (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ)
- প্রবেশ মূল্য ঃ ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

### ▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকবে ঃ

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- বড় দিন, ২৫ ডিসেম্বর

### ▶ টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ ঃ

- চাঁদ, শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, শনিগ্রহ, এণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী, রিংনেবুলা, সেভেন সিস্টার্স, জোড়াতারা ও তারার ঝাঁক।
- শনি ও রবিবার সূর্যাস্তের পর ১ ঘন্টা (আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)
- প্রবেশ মূল্য ঃ ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

### ▶ লাইব্রেরী ঃ

- রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯-০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫-০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

▶ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগতদের যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা রয়েছে

• Phone: 9112084 • Fax: 9114831 • www.nmst.gov.bd • www.facebook.com/infonmst • infonmst@gmail.com • infonmst@nmst.gov.bd